অঞ্জলি

সচিত্র অভিনব গল্প পুস্তক

"অঞ্জলি" সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

সচিত্র উপন্যাসাবলী

স্ত্রীপাঠ্য রাজসং, সুলভসং

কাকী-মা ... ১৲, ৸০

গৌরী-দান ... ১।০, ১৲

আর্য্য-কাহিনী ।৵০, ।০

বিষ-বিবাহ ... ।/০

সতী কি কলঙ্কিনী ।/০

পিসী-মা (যন্ত্রস্থ)

সচিত্র নাটকাবলী

পৌরাণিক

উর্ব্বশী-উদ্ধার ... ॥৵০

বভ্রুবাহন ... ।৵০

মৈথিলী (রাবণ-কন্যা-সীতা) ... ... ।০

সকল পুস্তকের ছাপা, কাগজ, চিত্রাবলী অত্যুৎকৃষ্ট, কি রচনানৈপুণ্যে, কি চরিত্রচিত্রে, কি ভাবমাধুর্য্যে বঙ্কু বাবুর পুস্তকাবলী সম্পূর্ণ নূতন ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ।

অঞ্জলি

আনুপ্রাসিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য গল্পের
একত্র সমাবেশ

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-সম্পাদিত

CALCUTTA

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY

201, Cornwallis Street.

1911.

মূল্য ॥৶৹ আনা মাত্র

PUBLISHED BY

BUNKU BEHARY DHUR

FROM THE

'BOSUDHA' OFFICE

22, Fakir Chand Chackerbutty's Lane, Calcutta.

Printed by A. Goffur,

At the New Britannia Press, 78, Amherst Street

Calcutta.

Illustrated by Srijut Preo Gopal Das.

1911.

বিজ্ঞাপন

১৩১৭ সালের মৎস পাদিত "বসুধা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় যে সকল গল্প বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে সেই গুলি লেখক বৃন্দের সম্মতি ক্রমে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে "অঞ্জলি" নামে প্রকাশ করিলাম। এবারে ইহাতে কয়েক খানি হাফ্‌টোন চিত্র সন্নিবেশীত করা হইল।

বঙ্গ সাহিত্যে গল্প পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু সে সকল গুলি প্রায় একই লেখকের কল্পনা প্রসূত।

"অঞ্জলিতে" বিভিন্ন লেখকের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে, এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণের ইহা মনোনীত হইলে আমি আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালব্ধ আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠবিশারদ মহাশয় "অঞ্জলি" প্রকাশে আমায় অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

বসুধা-কার্য্যালয়
২২, ফকির চাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সাল। } সম্পাদক

সূচী

চিত্রাবলী



মালতী মুক্তি ভ্রমে মৃত্যু-পথ আশ্রয় করিল।

[মালতী—৮ পৃষ্ঠা।

Sulov Press, Calcutta

আনুপ্রাসিক

গল্পমালা

কল্যাণী

(আনুপ্রাসিক গল্প)

(১)

কল্যাণী—কোন্নগরের কৃষ্ণকিশোর কর্ম্মকারের কন্যা। কল্যাণী—কামিনী কুলের কোহিনুর। কিন্তু কি কুক্ষণেই, কৃষ্ণকিশোর কুমারটুলির কর্ম্মকার কুলের কুলাঙ্গার কালাচাঁদকে 'কন্যাদান' করিয়াছিলেন।

কালাচাঁদ—কুড়েমীতে "কুম্ভকর্ণ"। কাপ্তেনীতে "কার্ত্তিক।" কুঞ্চিত কেশ কলাপে—"কুন্তল-কৌমুদী", কোঁচানো কালাপেড়ে কাপড়ে—"কিস্-মি-কুইক্", করাঙ্গুলে—কণকাঙ্গুরী, কোমলাঙ্গে ক্যানানুর কামিজ, কালা-মুখে—"কালী সিগার", কি কায়দায়—কি কেৰ্দ্দানিতে, কালাচাঁদ কিসে কম? ক্যারেক্টারে কালাচাঁদ, কদম তলার "কেলেসোনারই" কাছাকাছি।

কলিকালের কামদেব 'কালাচাঁদ', কলিকাতার "কিং কোম্পাণীর" "ক্লাসিক প্রেসে" কুড়ি-টাকায় কম্পোজিটারী করিত। 'করণ কষ্টিতে' কোনরূপে কাল কাটিত। কিন্তু, কল্যাণীর কেমন কুগ্রহ, কলিঙ্গার কুলটা "কুসুম" কলুনী—কুটিল কটাক্ষে কিম্ভূত কিমাকার কালাচাঁদের কাছে কুদৃষ্টি করিল!

(২)

কোথায় কসিত-কণক কান্তি কুললক্ষ্মী কল্যাণী,—কোথায় কুম্ভিপাক কুণ্ডের কৃমি—কলুষতি কলঙ্কিনী কুরূপা কুসুম। কৌশলী কন্দর্পের কঠিন কষাঘাতে, কামুকের কাছে কুৎসিতাও "কিন্নরী"! ক্লান্তি ক্লিষ্ট—কর্ম্মক্ষেত্রাগত কালাচাঁদকে, কলু কুমারী কুসুম, কিল-কিঞ্চিত কুহকে

করায়ত্ত করিল। কল্যাণী কি করিবে? কান্তের কুব্যবহারে কেবল কাঁদিত। কালাচাঁদের কাছে কোনও কথা কহিলে, কল্যাণীর করুণ ক্রন্দনে—কুলাঙ্গার কালাচাঁদ কর্ণপাত করিত না।

কেহ কালাচাঁদের কলঙ্কে-কটাক্ষ করিয়া, কুৎসা কি কাণাকাণি করিলে; কল্যাণী কেবল কাতরে কষ্টহারী কৃতান্তকেই কামনা করিত।

কুসুমের কপালে—"কেলনার কোম্পানীর কুক কৃত কবোষ্ণ কুক্কুট-ক্যারী, কাচ-পাত্রে ক্ল্যারেটমদ, কত কেক, ক্রুকেট্, কাটলেট্; কল্যাণী—কদন্নেরও কাঙ্গালিনী! কুলটার কক্ষ—কোচ কেদারা কার্পেট-ক্যাবিনেটে কণ্টকিত,—কল্যাণীর কপালে কুটীরবাস। কালাচাঁদের কার্য্যে কথা কহিবার কল্যাণী কে? কান্ত—কুলটার ক্রীড়নক; কুলবালা কষ্টের কাহিনী কাহার কাছে কহিবে?

(৩)

কুলটারা—ক্রোরপতি কুবেরকেও কাঙ্গাল করে, কালাচাঁদ কোন্ কীটানুকীট! কুসুমের কৃপালাভ করা—কুড়ি-টাকার কাজ কি? কাজে কাজেই কালাচাঁদ কর্জ্জ করিত। কুলটা-কক্ষে, কালাচাঁদ কল্পতরু! কুসুমের কাছে কৃপণতা করিবে কেন?

কালাচাঁদের কদর্য্য কাণ্ড কারকানায়, কল্যাণীর কোমল-কুসুম-কলেবর, কাশরোগে ক্রমশঃ কঙ্কাল-সার। কৃষ্ণকিশোর, কন্যার কাসের কথা—কোন্নগরের কৃতবিদ্য কবিরাজ—কৈলাশ-চন্দ্র কণ্ঠাভরণকাব্যতীর্থকে কহিলেন। কবিরাজ কত কি করিলেন। কিছুতেই কিন্তু কাসি কমিল না। করাল কাল—কৈশোরেই কল্যাণীকে কঠোর কবলে কবলিত করিল।

(৪)

ক্রমে কালাচাঁদ কাজ কর্ম্মে কাবাই করিয়া, "কুসুমের কুটিরে" কা'ল

কাটার। কালাচাঁদের কীর্ত্তি-কাহিনীতে "কিং কোম্পাণীর" কার্য্যাধ্যক্ষ—কৃত্তিবাস—কালাচাঁদকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কুহকিনীর কুচক্রে, কালাচাঁদ—কলত্রহীন, কপর্দ্দকের কাঙ্গাল।

কুসুমের কথায়, কস্মিনকালে কুসীদ-জীবির কাছে, কিস্তির কড়ারে কিছু কর্জ্জ করিয়া, কালী কাহাড়ী কোলইয়ারীর কোক কোল কিনিয়া, কালাচাঁদ কয়লার কারখানা করিল। কিন্তু কদাচারীকে কমলা—কৃপা করিবেন কেন? কুপুত্রতায়—কালাচাঁদের কারবার কাঁচিল, কুসুমের কাছেও কদর কমিল। কুসুমের কেলিকুঞ্জে কেবল কলহ কচ্‌কচি। কিন্নর কণ্ঠীর কণ্ঠস্বরে—কনসার্ট ক্লাবের ক্লারিয়নেট কুহরিত, কমলার কুদৃষ্টিতে কমলাস্যে কেবল কড়াকড়া কথা।

কসবীর কপট-কামের কারসাজিতে, ক্রুব্ধ কালাচাঁদ—কান্ত কল্যাণীর কারণে কৃতানুতাপে কতই কাঁদিল। কোপে কাটারী কর্ত্তৃক কুলটার কণ্ঠচ্ছেদ করিল!

কোর্টে কৃত-কসুর কবুল করায়, করোনারেরা কালাচাঁদের কারা-ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কপালক্রমে, কারাবাস কালেই কাম-কিঙ্কর কালাচাঁদ কঠিন কার্য্য করিয়া কুপকাৎ করিল।

কমলাকান্ত

[অনুপ্রাসিক গল্প]

"ক"

কলিকাতার কাছাকাছি কালীঘাটের কমলাকান্ত, কৃষ্ণগঞ্জের কাঁসারী পাড়ার—করালীকুমার করের কনিষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনীর কর ক্রয় করিয়াছিল। করুণাময়ী কালিকার করুণায়, কমলাকান্তের কামানুযায়ী কতিপয় কমলকোরকোপম কুমার কুমারী, কাদম্বিনীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিল ; কিছুকাল কৌতুকেও কাটিল।

কমলাকান্ত "কুক কেলভি" কোম্পানীর কারখানায় কেরাণীর কর্ম্ম করিত। কাদম্বিনীর কেমন কপাল !—কস্‌বীটোলার কোনও কৃষ্ণকায়—কুৎসিতা কামিনী, কথার কৌশলে কামের কুহকে—কমলাকান্তকে করায়ত্ত করিল ! কাজে কাজেই—কম্বুকণ্ঠি কসিত কণক-কান্তি—কাদম্বিনীর কপালে কদলী !

কমলাকান্ত, কুহকিনী কামিনীর "কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটিরে", কোনও কাজে কখনও কৃপণতা করিত না। কিন্তু কেহ কেহ কমলাকান্তকে কৃপণ কহিত।—কুহকিনী—কাবাব, কাটলেট, কেক্, কারী, কোর্ম্মা করিয়া কমলাকান্তের কায়ক্লেশে কামানো কড়ির কর্ম্ম কাবার করিত ! কাদম্বিনী কি করিবেন ? কাঁদিয়া কাটিয়া, কষ্টে, কোনরূপে কাল কাটাইতেন ; কেননা, কান্তকে কষ্টের কথা কহিলে—কর্ণপাত করিত না, কেবল কুকথা কহিত ! কিন্তু কাদম্বিনী—কান্তের কুব্যবহারের কথা কখনো কাহারও কাছে কহিতেন না। কেহ কমলাকান্তের কলঙ্কে

কটাক্ষ করিয়া. কোনও কুৎসা করিলে, কেবল কাঁদিতেন। কুমার কুমারী কয়টীর কারণে কিছু কিছু কর্জ্জ করিতেন। কর্জ্জ করিয়া কয়দিন কাটিবে? কাজেই কান্তপ্রাণা কাদম্বিনী—কান্তের কাছে কর্জ্জের কথা কহিলেন—কত কাঁদিলেন—কত কাকুতি করিলেন—কিন্তু—কঠিনচিত্ত কিম্ভূত কিম্ভাকার—কমলাকান্ত—কাদম্বিনীর কথা কেয়ার করিল না!

ক্রমে, কান্তের কদর্য্য কাণ্ডকারখানায়, ক্লিষ্ট কলেবরা কাদম্বিনীর "কুসুম-কোমল-কমনীয়" কায়া—কাশরোগে কাহিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করালীকুমার—কন্যার কাসের কথা, কাঁচড়াপাড়ার কৃপাসিন্ধু কাব্যচঞ্চু—কবিরাজকে কহিলেন, কবিরাজও—"কুষ্মাণ্ডখণ্ড", "কাঞ্চনাভ্র", "কুঙ্কুমঘৃত", "কিন্নরকণ্ঠ", "কনকাসব", "কল্যাণসুন্দর"—কত কি করিলেন, কিছুতেই কাদম্বিনীর কাসি কমিল না, "কডলিভার" কোন কাজ করিলনা।

কাল কি কস্মিনকালে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? করিবে কেন? কার্ত্তিক মাসে—কাদম্বিনীকে—কৃতান্ত কঠোর কবলে কবলিত করিল! কন্যা-শোক-কাতর করালীকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী-যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের কোটা—কস্মিংশ্চিৎ কাপ্তেন কিনিল।

ক্রমে, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা—কমলাকান্তকে কুদৃষ্টি করাতে, কমলাকান্ত কাজে কামাই করিল, কুহকিনীর "কুঞ্জকুটীরে" কাল কাটায়। কাজেই—"কুক্‌কেলভী কোম্পানীর কর্ত্তাটী—কোপে কটূক্তি করিয়া—কমলাকান্তকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কুক্ষণে কর্জ্জ করিয়া কমলাকান্ত কারাগার করিল।

কালক্রমে, কায়স্থ-কুল কলঙ্ক কামুক কমলাকান্ত—কর্জ্জের কল্যাণে কারাগারে কিছুকাল কাটাইয়া—কলেরায় কুপোকাৎ করিল!!

প্রমদার পরিণয়

(অনুপ্রাসিক গল্প)

"প"

প্রসাদপুরের পূর্ব্বপাড়ার পরমেশ-পরায়ণ পুণ্যাত্মা প্রসিদ্ধ পঞ্চানন পাত্রের প্রথম পুত্র প্রমদা পাত্র। প্রমদা পাত্র প্রথমে প্রথানুযায়ী পাড়ার পাঠশালাতেই পড়িতেন। পাঠশালার পাঠ পরিশেষের পর প্রাণপণ পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রশংসা পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাটনার প্রসিদ্ধ পাঠমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পাটনা পাঠমন্দিরে প্রবেশের পরেই, পুত্রবধূর প্রফুল্ল পদ্মানন পরিদর্শনে প্রীতি প্রাপ্তির প্রত্যাশায়, পিতা পঞ্চানন পাত্র পনেরই পৌষে পুত্র পাশে পত্র পাঠাইলেন। পিতৃপরায়ণ পুত্র প্রমদা পাত্র পাঠান্তে পিতার পরিতোষার্থ পরিণয়ে পশ্চাৎপদের পরিবর্ত্তে প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রমদার পিতামহী পদ্মাবতীই প্রথমে প্রমদার পরিণয়ের প্রস্তাব পাড়েন। পরে প্রস্তাবে প্রফুল্লতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রমদার পরিণয়ার্থ প্রমদা-প্রসূতী পার্ব্বতীর পতিব প্রতি পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি। পঞ্চানন পাত্রও পত্নীর পীড়াপীড়িতে পুত্রের পরিণয়ার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাত্র্যান্বেষণে প্রমদার পিসী প্রভাবতীর পাড়ায় পাড়ায় পর্য্যটন ও পরিশেষে প্রতাপপুরের প্রবল-প্রতাপ প্রতাপ পালের পঞ্চমা পুত্রীই প্রমদার পাত্রীরূপে পরিগণিতা। প্রসাদপুরের পাড়াপড়শীরা পঞ্চানন-প্রাসাদে পরিণয়োৎসবে প্রমত্ত। পরমেশ প্রসাদে, পঞ্চদশে পড়িবার পরেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসের পূর্ব্বে পঠদ্দশাতেই প্রমদাপতির পরম পরিতোষে প্রতাপ পুত্রী পারুলের পাণিপীড়ন। পিতা,

পিতামহী, প্রসূতী ও পিসী প্রমদা-প্রমদার প্রোম্ভিন্ন-পঙ্কজিনী প্রতিম প্রফুল্লানন পরিদর্শনে পরিতুষ্ট। পাড়াপড়সীরা পাত্র-প্রাসাদে পাঁচ দিন পেট পূরাতে পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত। প্রমদাও পরীপ্রায় পদ্ম-পলাশাক্ষী পরিণতাঙ্গী প্রমদা প্রাপ্তে প্রমোদিত।

পারুলকে পত্নীরূপে পাশে পাইয়া পত্নী প্রেমে পাগল-প্রায় প্রমদা পাত্র পাসের প্রলোভন পূর্ণরূপে পাসরিলেন। পাঠাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পায়ে পা পাড়িয়া প্রসাদপুরের প্রমোদ-প্রাসাদে প্রমদা প্রসঙ্গে প্রমোদে প্রমত্ত।

পুত্রের পরিণয়ের পর প্রমদার পিতা পঞ্চানন পাত্রের, পরে পর্য্যায়-ক্রমে পিতামহী পদ্মাবতীর, প্রসূতী পার্ব্বতীর, পিসী-মা প্রভাবতীর পর-লোকে প্রস্থান।

পাড়া প্রতিবাসীর পরামর্শে পিতৃ পিতামহী প্রভৃতির প্রেতকৃত্যে প্রভূত পয়সা প্রদানে, প্রমদার পৈত্রিক পয়সার পলায়ন ও পরে পারুলের পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্ল পদ্মকোরক প্রতিম পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটী পুত্রী প্রসব। পশ্চাৎ প্রমদা পাত্রের পরিবার প্রতিপালন প্রতুল ও পারুলের পিত্রালয়ে প্রস্থান। পরিশেষে পেট পূরণের প্যাঁচে পড়িয়া পাড়ার পোষ্ট পিয়নের পদে প্রবৃত্ত ও পাঁচমাস পরেই পেটের পীড়ায় প্রিয়তম পত্নী পারুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমদার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি।

বিপিন বিহারীর বাণিজ্য

(আনুপ্রাসিক গল্প)

"ব"

বাবুর বাজারের বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল বৈভবসম্পন্ন বনিয়াদি বংশোদ্ভব বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। বিগত বারশত বায়াত্তর বঙ্গাব্দের বারই বৈশাখ বাইশ বৎসর বয়সে বিপিন বরিশালের বিখ্যাত বংশজ বৃন্দাবন বাবুর বালিকা বিভাবতীকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধিলেন। বিবাহ বাসরে বহুমূল্য বালা বাজু বডিজ ও বেনারসী বস্ত্রাদি বিভূষিতা বিভাবতীকে বাল-বিভাকর-বিভা-বিনিন্দিত বিমলা বোধে বিপিনের বুকে বাত্যা-বিক্ষোভিত বারিধি বক্ষবৎ বড়ই বিলোড়ন বাড়িল।

—বিবাহান্তে বার বৎসর বিপুলানন্দেই বহিল।

ব্যবসা বানিজ্যে বিপিন বিশেষ ব্যুৎপন্ন। বৃন্দাবনের বুদ্ধিমত বিপিন বর্দ্ধমানে বাণিজ্যে বসিলেন। বাণিজ্যেই বরদার বাস। বৎসরেক ব্যবসায়েই বিপিনের বিষয় ও বৈভব বেশ বাড়িল।

বর্দ্ধমানে বিপিনের বাসার বামেই বিন্দুবাসিনী বলিয়া বারবনিতার বাড়ী। বিন্দু বিপিনের বক্ষে বিষবাণ বিক্ষেপের বন্দোবস্তে বিশেষ ব্যস্ত। বলা বাহুল্য, বিপিন বারাঙ্গনার বিস বিশেষ বুঝিলেন না, বরং বিন্দুর ব্যবহারে বিপুলানন্দ বোধে বিনাবিলম্বেই বিন্দুকে বক্ষে বসাইলেন ও বিন্দুর বাড়ীখানি বাছা বাছা ব্রিক বালি বিম বরগাদিতে বহুব্যয়ে বানাইলেন। বিলাতের বানান বহুমূল্য ব্রেস্‌লেট ব্রুচ বডিজ বেনিয়ানাদি বিবিধ বিলাস বস্তুতে বিন্দুর বাক্স বাড়িল।

বলা বাহুল্য বিন্দু বিপিনকে বিশেষ ভাবেই বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিল; বিপিন

বাণিজ্য-ব্যবসা বিস্তারের বাসনা বিসর্জ্জিয়া বিন্দুর বিলাসবাসকেই বাস-স্থান বা বিশ্রামাগার বানাইলেন।

বিভাবতী বারংবার বিশেষ বিনম্র বচনে বিপিনকে বহু বুঝাইলেন, বৃন্দাবন বাবু বহু বিষয়ে বলিলেন ;—বিপিন বুঝিলেন না। বরং বিন্দুর বাসনানুসারে বাপদাদার বানান বহু বৎসরের বিষয় বৈভবাদি, বসত বাটী বন্ধকে বিন্দুর বিড়াল বিড়ালীর বিবাহোৎসবে বিস্তর ব্যয় বহিলেন।

বিষাদাবনতা বিভাবতী বৎসরেক বাপের বাড়ীতে বসিয়া বিপিনের ব্যবহারে বিশেষ বিমর্ষ ও বিষপানেই বাল্যজীবন বিসর্জ্জিলেন।

বুড়োর বিয়ে

(আনুপ্রাসিক গল্প)

(১)

বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ, বড়ই বোকামী ;—বিশেষতঃ বংশধর বর্ত্তমানে—বেকুব ব্যোমকেশ বুঝিয়াও বাঁকিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ, বাড়ী—বরিশালের বিনোদপুরে, ব'নেদী বড়লোক বলিয়াও বিখ্যাত। বনিতা "বরদাময়ী"র বিয়োগে, ব্যোম-কেশের বিবাহের বাতিকটা বিলক্ষণই বাড়িয়াছিল। বৌদ্ধযুগের বিচক্ষণ বৈদ্য "বাগভট" বলেন,—বক্ষ্যমাণ বায়ুব্যাধিতে, বরং "বিষ্ণু-তৈল" ব্যবহারই বিধি।

বান্ধববর্গের বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তিতে ব্যোমকেশ বেজায় বিরক্ত ; বাহাত্তর বিঘা ব্রহ্মোত্তরের বদলে, ব'ড়শে বেহালার ব্রজেশ্বর বাগ্‌চীর বৈমাত্র্য বোন্ "বনবালাকে," বিশে বৈশাখ বৃহস্পতি বারে বেআক্কেলে বাঙ্গাল—বিবাহ বন্ধনে বাঁধিল !

বাস্তবিক বিনাশকালে বুড়ার বিপরীত বুদ্ধি ! বাষট্টি বছরের বে-রসিক বর—বাসরে বসিলে, বনবালার বয়স্যারা বুঝিল—বিবাহের ব্যাখ্যা—"বোধনে বিসর্জ্জন" বা "বালিকার বলিদান" ! বরটী 'বয়সে' বাপের বড় বলিয়া বনবালাও বড় বিমর্ষ !

বনবালা—বেথুন বিদ্যালয়ের বিদুষী, বাক্‌পটুতায় বটতলার বর্ষীয়সী বীণাপাণি, বেশবিন্যাসে বাসরের বিদ্যাধরী। বুদ্ধিমতী বনবালা বুদ্ধিবলে বুড়ো বরকে বানর বানাইল ! বালিকা বধূর 'বনেট্ ব্লুম, বডি বোকের' বায়নায় ব্রাহ্মণ বিষম বিব্রত ! বনবালার বিধুমুখই বুঝি বুড়ার বৈকুণ্ঠ !!

বনবালার বরাত বাঁকা। বৎসরান্তে, "বেরিবেরি" ব্যারামে—ব্যোমকেশ বিগতপ্রাণ। বারো বছরেই বিকাশোন্মুখী বালিকা বিধবা!

বেটার বোয়েতে, বনবালাতে বিবাদ বাধিল! বঙ্গের বাল-বিধবা—বাড়ীর বালাই। বিধবার বিলাপে—বৈবস্বতও বধির! বিবাদ বিসম্বাদে ব্যতিব্যস্ত বনবালা, ব্রজেশ্বরের বচনে বুড়ার বিষয় বৈভব বেচিল। বলা বাহুল্য, বাপের বাড়ীতে বাসই বনবালার বাসনা।

(২)

বয়োসন্ধিতে, বল্লভ-বঞ্চিতা বিষাদিনী বিধবার বিরস বয়ান বিলোকনে ব্রজেশ্বর বিষণ্ণ। বরবর্ণিনী বনবালার বর্ত্তুলাকার বর-বপুর বাঁধুনীটী বেশ! বিম্বোষ্ঠীর বালেন্দু বর্ণবিভা—বৃন্দারকেরও বাঞ্ছনীয়!!

ব্যাস বশিষ্ঠাদি বেদ বিশারদেরা বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার ব্রত। বিলাস বিভ্রম—বিধবার বর্জ্জনীয়।" বাপের বাড়ীতে, বাধাবন্ধন-বিমুক্ত বিধবার বেচাল বাড়িল। বলিয়াছি, বনবালা বাল্যাবধি বিলাসিনী। বিলাসিতা বিধবার বৈরী। বনবালা বিত্তবান্ ব্যক্তির বনিতা, ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী বেশ-বিন্যাসের বাহারেই ব্যাপৃতা! বাত্যা বিলোড়িত বীচি-বিক্ষুব্ধ বিভীষণ বারিধি-বক্ষে, বন্যার বিশাল বিবর্ত্তনে, বাহিত্র বিহনে, "বজরা" বুড়িবে বৈকি!

বনবালাদের বাড়ীর বামপার্শ্বে, বোণ্টন ব্রাদার্সের বুক-বিচারক বিনোদ-বিহারী বসুর বাসা। বিনোদ—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি—এ, বিপত্নীক, বেহদ্দ বাবু, বক্তৃতা বাগীশ, ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিশ্বাসী, বাল্য-বিবাহে বিদ্বেষী, বাহ্যতঃ বিনীতও বটে! বিনোদ, বনবালার বড়্ দা'র বন্ধু।

বিনোদের বহুমূল্য বসন, বিলাতী বার্নিশ বুট, ব্রেজিল-চস্‌মা, বহরমপুরী বাপ্তার বার্ম্মা-কোট, বাঁকা-টেড়ী, বাদসাই বোল, বাইক বাহনে

বিহার, বামা-ঝশের ব্রহ্মাস্ত্র! বৈকালে, বনবালা বারাণ্ডায় বসিয়া, বৈশ্য বংশোদ্ভব বলাই বাবুদের "বেণী-বিভ্রমায়" বেণী বিনাইত, বিনোদ—বহির্বাটীর বাতায়নে বসিতেন! বিদ্যুদ্বর্ষি বিলোল বীক্ষণ বিনিময়ে, বিনোদ বিমোহিত, বনবালাও বিচলিতা।

বিনোদের বঙ্কিম-ভ্রু-বিভঙ্গি, বিধুরা বনবালার বুকে বজ্রবৎ বিঁধিল।

(৩)

বন্ধুবা বিধবা বোনটীর বৈধব্য-বিমোচনে, বিনোদ বিশেষ ব্যগ্র! বিনোদ বারম্বার বিতর্ক বিতণ্ডায়, ব্রজেশ্বরকে, "বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা বুঝাইলেন। বিধবা-বিবাহে বরাবর বিজাতীয় বিতৃষ্ণা বশতঃ ব্রজেশ্বর বিনোদকে বলিলেন,—"বঙ্গ বিধবার বিবাহ, বেদ-বহির্ভূত বর্ব্বরোচিত ব্যাপার!"

বিরক্ত বিনোদ বাবু, বহুব্যয়ে বিরাজ বৈষ্ণবীকে বাগাইলেন। বৈষ্ণবীর ব্যবসাই—বিদেশী বঁধুদের "বৃন্দেগিরি।" বিনোদের বিনিয়োগে—বিরাজ, বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা বালবিধবার বিমল বক্ষে, "বসুমতীর" বিজ্ঞাপনে বিতবিত বঙ্কিমবাবুর বই—"বিষবৃক্ষের" বীজ বুনিল। বিনয়-বচনে বালিকাকে বলিল,—"বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, বিনোদই বনবালার ব্যথার ব্যথী, বিনোদ, বিকট বিরহ বিকারে—বিশ্ব বিদিত "বীচামের বড়ী।"

বেদনায় ব্লিষ্টার বসাইলে ব্যথাই বাড়ে——বৈষ্ণবীর বাক্যে বনবালা বিপথগামিনী! ব্যাধের বংশধ্বনিতে বিমুগ্ধা বনমৃগী—বাগুরায় বদ্ধ। বনবালা বিনামূল্যেই বিকাইল!

বিনোদে বনবালাতে, বিরলে, বিশ্রম্ভালাপে বিপক্ষেরা বগল বাজাইল। বাজারে—বাড়ী বাড়ী, বনবালার বদনামের বিষাণ বাজিল। বনবালার 'বৌ-দি'—বিষদৃশ বৃত্তান্ত ব্রজেশ্বরকে বিস্তারিয়া বলিলেন। বাড়ীতে বিভ্রাট বাধিল। ব্রজেশ্বর ব্রীড়াবিনত বদনা বহিনকে বিস্তর বকিলেন।

বনবালার বেশভূষা বারণ, বেড়ানো বন্ধ। বাঁধাবাঁধির বাড়াবাড়ীতে, বঁধু-বিচ্ছেদের বিভীষিকায় বনবালা ব্যাকুল। ব্রাহ্মণের বাতুলতায়, বালিকার বিবেক বুদ্ধি বিগ্‌ড়াইল। বাগ্‌ বুঝিয়া, বোঁচ্‌কা বুঁচকি বাঁধিয়া, বিরাজের বন্দোবস্তে, বিঘোরা বিভাবরীতে, বিবেকবর্জ্জিতা বিধবা বাটীর বাহির! বিষমেষু-বাণ ব্যথিতা বাম-লোচনা বংশমর্য্যাদাও বিস্মৃতা, বাল বিধবার বুভুক্ষিত বলয়াঙ্কিত বিশীর্ণ বাহু বল্লরী, বিনোদের বিস্ফারিত বেপমান বক্ষে বিজড়িত! বনবালার বিদায় ব্রজেশ্বর বুঝিলেন—বর্ষার বেগবতী বারিস্রোতে—বালির বাঁধ বিফল!

(৪)

বালিগঞ্জের 'বাউড়ী বস্তি'তে—বাঁড়ুযোদের বাগানবাড়ী। বাড়ীটী—বিলাসীর ব্যবহারোপযোগী, বাগানটীও বিস্তীর্ণ, বিবিধ বিহঙ্গ-বিরাব-ব্যাপী বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষবীথিকায় বেষ্টিত!

বিজন বাগান বাড়ীতে বিরাজ ও বনমালা বিরাজমানা। বিশালাক্ষী বিধুবদনীর বাসার্থে, বিনোদ বাঁড়ুযোদের বাংলোটীই বাছিয়াছিলেন।

বিনোদের বন্ধুরা, বসন্তের বেলাবসানে, বিকসিত বেল-বকুল বসোরায় বিভোর বাগানবাড়ীতে, "বাগান-পার্টির' বৈঠক বসাইলেন। বাবুদের বিরামকুঞ্জে বেশ বাতাস বহিতেছিল। বেস্থরা বেহাগ বাজিতেছিল, বেলয়ে বাঁয়া বাজাইতেছিলেন—বিনোদবাবু! বিজলী বিনিন্দিত বিভাবতী বনবালা, বিচিত্র বেত্রাসনে বসিয়া, বোতলবাসিনী বারুণী বিলাইতেছিলেন, ব্রাণ্ডী-বিকৃত বিমান-বিদারি বিকটোচ্ছাসে বাঙ্গালী বাবুরা বেহায়া বনবালাকে বলিতেছিলেন—"বন্দেগী বাইজি! ব্রেভোঃ ব্রেভোঃ!!"

বাগানে বথামীর বহুৎ বাড়বাড়ন্ত, বলিহারী বনবালাকে! বিনোদও বাহাদুর ব্যক্তি বটে!

(৫)

বিবাহের ব্যপদেশে, ব্যভিচারের বহ্নি-বৈঠকে বসিয়া, বাগান বাড়ীতে —বিপুলানন্দে বনবালার বর্ষদ্বয় বিগত।

বিনোদের বাবুগিরিতে, বনবালার বিবিয়ানায়, বিপুল ব্যয়। বিনোদ বেকার, বনবালাও বিত্ত-বিহীনা, বেগতিক বুঝিয়া বন্ধুরাও বিমুখ।

বিধি বিড়ম্বনায়, বদ্‌মাইস বিনোদ "বোম-বিপাকে" [Bomb Case] বিজড়িত। বিপ্লববাদী বিবেচনায়, বিচারে—বিনোদের ব্যানিস্‌মেণ্ট, [Banishment] বেচারা বনবালার বিপদ!

বিশুদ্ধ বৈধব্য-ব্রত-বিচ্যুতা বারাঙ্গনা বিপথগামিনী বিপ্রবালা বিরাগে বারাণসী-বাসিনী!

বঙ্গের বিধবা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বামদেবেরও বন্দনীয়া, ব্রহ্মচর্য্যাই বালবিধবার—বল্‌গা। বিবাহের বদলে, ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার বরণীয়। বিংশ-শতাব্দীর বাঙ্গালী বাবুরা, বৃদ্ধদের বাক্যটি বুঝিবেন?

জ্যোতিষী

(সামাজিক আখ্যায়িকা)

[১]

বুদ্ধিমন্ত লোকের উপর আমার পূর্ণ শত্রুতা আছে, কেননা আমি নির্ব্বোধ! যিনি লেখেন—তিনি বুদ্ধিমান্, যিনি পড়েন—তিনিও বুদ্ধিমান্, আমি নির্ব্বোধ—সুতরাং চুপ্ করিয়া থাকি। বুদ্ধিমানের কথায় কথা কহিলে আমায় গালি খাইতে হয়। এই জন্য সংসারের সহিত আমার কখনো বনিল না। এই জন্য—আজ আমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছি। কিন্তু আমার এ সন্ন্যাস বৃথা—সংসারের প্রলোভন ত্যাগ করিয়াও যাহার হৃদয় অরুন্তুদ যন্ত্রণায় অস্থির—সে আবার সন্ন্যাসী সাজে কেন? সেই কথাই আজ বলিব।

বুদ্ধিমন্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, মনের দুঃখ অপরের কাছে বলিলে তাহা নাকি অনেকটা লঘু হইয়া যায়। তাই আজ সাধারণের কাছে এ নির্ব্বোধ স্বীয় জীবনের প্রশস্ত কক্ষ উদঘাটন করিতেছে, সহৃদয় পাঠক! তুমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া কি এ নির্ব্বোধের একটা প্রাণের কথা শুনিবে না।

প্রথমে আমার পরিচয়টা না দিলে এ আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। আমার নাম "গণেশ।" কিন্তু আমি নির্ব্বোধ বলিয়া, পাড়ার লোকে আমায় "গোবর

গণেশ" বলিত। বলা বাহুল্য আমার প্রতিবাসীরা সকলেই—বুদ্ধিমান্, তাই আমার উপর তাঁদের এই আক্রোশ। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এখন, ভেক শিশুর লাঙ্গুলের মত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, আমার নাম হইতে গোবরত্ব টুকু খসিয়া গিয়াছে। অতএব গণেশ বলিলেই এখন আমায় লোকে চিনিতে পারে, পূর্ব্বে গোবর না বসাইলে—কেহ আমায় স্মরণ পথে আনিতে পারিত না।

আজ চারি বৎসর হইল, আমার পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিই এখন পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী। পিতা জমীদার ছিলেন, সালিয়ানা বারো হাজার টাকা তাঁহার আয় ছিল। কিন্তু অমিতব্যয়িতা দোষে—তিনি অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা—কৌশলে সেই সকল সম্পত্তির অধিকাংশই হস্তগত করিয়াছেন, এখন আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় না হইলেও—তাহাকে স্বচ্ছল বলিতে পারি না, 'মোটা ভাত', মোটা কাপড় একরকম চলিয়া যায়। সংসারে মা ভিন্ন আর আমার কেহই নাই।

উপন্যাসের খাতিরে আমাকেই আমার রূপ বর্ণনা করিতে হইল, কি করিব? কিন্তু তোমরা উপহাস করিও না। আমার এ জীবনকে রসিকতার বিজৃম্ভণ ভাবিও না। আমি দিব্য সুন্দর পুরুষ। তবে উপন্যাসস্থ নায়কের "বিশাল বক্ষঃ", "প্রসস্ত ললাট", "দীর্ঘ বাহু", "মুখচন্দ্র প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ থাকে, আমার সে সব কিছুই নাই, তবুও আমি সুপুরুষ। হায়! এক চক্ষু ভগবান, সকলকেই তো আমার মত এবং আমার মায়ের মত চক্ষু দেন নাই, তাই চক্রবর্ত্তীদের "বিনী" সে দিন অন্ধকারে আমায় দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল! বিনীর উপর আমি সেই অবধি হাড়ে হাড়ে চটা। আমার একজন প্রিয় বন্ধু আমার এই রাগ দেখিয়া, আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"বিনী ভয়ে চীৎকার করে নাই, ওটা মোহিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ!"

[২]

বাঙ্গালীর চৌদ্দ পুরুষ—বরাবরই বিবাহ করিয়া আসিতেছে। উদরান্নের সংস্থান থাক্ বা না থাক্, মাথা গুঁজিবার স্থানের অভাব থাক বা না থাক, যথা সময়ে "নববধূ" ও "নবকুমারের" আগমনের ত্রুটী বাঙ্গালীর গৃহে দেখিতে পাইবে না। বাঙ্গালীর মা—নিতান্ত গরীব হইলেও—পুত্রবধূ এবং পৌত্রের মুখ না দেখিয়া মরিতে চাহেন না। বলা বাহুল্য, আমার মাতা ঠাকুরাণীও এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। চাঁদপানা বৌ আনিতে তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

আমাদের গ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে আমার এক মাসী মা ছিলেন, মা তাহাকেই পাত্রী সন্ধানের ভার দিলেন। পূর্ব্ব সৌভাগ্য অন্তঃহৃত হওয়ায় অনেকেই আমাদের শত্রু হইয়াছিল। যাহারা একদিন আমাব পিতার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য লালায়িত ছিল, সেই সব "বসন্তের কোকিলগণ" আমাদের এই "বর্ষার দিনে" একবারও উঁকি মারিত না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পাড়ার লোকে যাহাতে বিবাহের কথা ঘুর্ণাক্ষরে জানিতে না পারে, মা আমার তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে মাসীমাও—একটী, কন্যা স্থির করিয়া—আমার মার কাছে সংবাদ পাঠাইলেন।

মাসীমার পত্রপাঠে বুঝিলাম মেয়েটী খুব সুন্দরী, ঈশ্বর করুন মাসীমার কথা যেন সত্য হয়। স্ত্রী সুন্দরী হইবে—এ সাধ সকলেই করে। মানুষ সৌন্দর্য্যের দাস। সৌন্দর্য্যের মাঝে "ভীষ্মের পিপাসা" লুকানো আছে। সে পিপাসা চক্ষের নহে, আত্মার। ঘোরা বিভাবরীর বিলাস-বক্ষে—যাহার শয্যাপার্শ্বে—একখানি সৌন্দর্য্যমাখা হাঁসিমুখ আলো করিয়া থাকে, সে অবশ্যই বুঝিতে পাবে যে মানবের স্বর্গ কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা কথা নহে।

তাই বলিতেছিলাম, মানুষ সৌন্দর্য্যের দাস। ভাবী পত্নীর সৌন্দর্য্যের কথায় তাই আমার আজি এত আনন্দ। যাহাকে জীবনের জীবনী করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আঁকিয়া রাখিব—যাহার সম্মুখে আমার এই রূপের ঝোঝাটী নামাইব—সে যদি সুন্দর না হয়, বল দেখি ভাই!—তাঁহা হইলে "বনবাস" কি প্রিয় বোধ হয় না?

আমার মাতৃদেবী স্বয়ংই কন্যা দেখিয়া আসিলেন। কন্যাপক্ষও যথা-সময়ে বর দেখিয়া গেল। উভয় পক্ষের অনুমতিতে—১৫ই বৈশাখ—শুভ বিবাহের দিন স্থির হইল। আমার আর আনন্দ ধরে না। সম্মুখে জীবনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত! ভাবী সুখের আশায় আমার অন্তর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া, দেবী অবগাহনের জন্য—আমি আমার চিত্ত-কুশাসন বিছাইয়া রাখিলাম। আমার কণ্ঠস্বরে—রজকপালিত প্রাণী বিশেষের কণ্ঠস্বরের সামঞ্জস্য থাকিলেও—আমি সর্ব্বদাই গুণ গুণ স্বরে গাহিতে লাগিলাম। যে সকল বন্ধু অনুক্ষণ আমার কাছে থাকিতেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার মুখে—"তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে মিলিয়া মিলিয়া রে—" এই প্রিয় সঙ্গীতটী শুনিতে পাইতেন। ছেলে বেলায় বেশী লেখা পড়া শিখি নাই, কিন্তু এ বিবাহের হুজুগে—দু'এক দিস্তা কাগজ—স্বরচিত পয়ার রসে সিক্ত করিয়া ফেলিলাম।

[৩]

আজ ১২ই বৈশাখ। মধ্যে আর দুইটী দিনের ব্যবধান, তাহা হইলেই আমার সাধের শয্যালয় প্রেমের কুমুদ্ কহ্লার ফুটিয়া উঠিবে। পুরোহিত মহাশয় আজই আমার "গাত্র হরিদ্রার" ব্যবস্থা দিয়াছেন। মা আমার আজ আনন্দে আত্মহারা, তাই সাধ করিয়া একদল বাজনা আনাইয়াছেন।

শুভক্ষণে আমার গায়ে হলুদ চুকিয়া গেল, কম্বু কুম্বীরা কম্বু নাদে আমাদের সুষুপ্ত ক্ষুদ্র ভবনটী জাগাইয়া তুলিলেন।

অন্য সময়ে কেহ বড় একটা আমাদের বাড়ী আসিতেন না, কিন্তু এই বিবাহ উপলক্ষ্যে আমার একজন কাকা আসিয়া "শুভ কর্ম্মের" সহায় হইলেন; ইনিই একদিন আমার পিতৃসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কাকার আগমনটা আমার তত প্রিয় বোধ হইল না। কিন্তু মা বলিলেন—"ঠাকুরপো আসিয়াছেন, ভালই—আমার তো লোকবল নাই—উনিই দাঁড়াইয়া বিবাহ দিবেন।"

হায়—মা হিন্দুরমণি! আনন্দের দিনে চিরশত্রুও আজ তোমার কাছে অনাদৃত নহে। তোমার মত হৃদয় যে স্বর্গেও দুর্লভ মা! কথা প্রসঙ্গে কাকা বলিলেন, "বৌ! তুমি একবার মেয়ের কোষ্টী খানা আনাও, গণেশের কোষ্টী আছে না? তবু একবার মেয়ের কোষ্টীটা মিলাইয়া দেখা ভাল। বিবাহে যখন দুইজনের ভাবী জীবন নির্ভর করে, তখন সব দিক দেখিয়া শুনিয়া দেওয়াই উচিত।" কাকার কথায় মারও মন ভিজিল।

পরদিন প্রাতে লোক পাঠাইয়া কন্যার কোষ্টী আনয়ন করা হইল, আমাদের উভয়েরই কোষ্টী কাকার হাতে দেওয়া হইল।

আমাদের দেশে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য নামক জনেক জ্যোতিষী ছিলেন। কোষ্টী লইয়া কাকা সেই জ্যোতিষীর গৃহে অবতীর্ণ হইলেন। জ্যোতিষীর উপর আমার আন্তরিক অবিশ্বাস ছিল, কাজেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে আমি খুল্লতাত মহাশয়ের পশ্চাদানুসরণ করিলাম।

জ্যোতিষী মহাশয়—উভয় কোষ্টী লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলেন, তারপর কাকাকে বলিলেন—"এ বিবাহে সমূহ অমঙ্গল দেখিতেছি। কন্যার কোষ্টীতে লেখা আছে যে সে বিবাহের ছয় মাস পরে বিধবা হইবে; আবার বরের কোষ্টীতেও দেখিতেছি—বর বিবাহের ছয় মাস পরে বিপত্নীক হইবে। এ বিবাহে আপনারা নিরস্ত হউন, ইহাই আমার অনুরোধ।"

জ্যোতিষীর গণনা শুনিয়া—আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, ইন্দ্রিয়

সকল অবশ হইয়া আসিল, আমি বসিয়া পড়িলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী আসিলাম, আসিয়া দেখিলাম—আমাদের বাটীতে বিবাহের উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মা বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন, সম্মুখে কোষ্ঠী হাতে করিয়া কাকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

[৪]

একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার কাকার একটী গুণধর পুত্র আছে, তাহার নাম রমানাথ। ছেলেটী দশকর্ম্মান্বিত! প্রত্যহ দশ ছিলিম গাঁজা না খাইলে, তাহার উদর নামক বৃহৎ গহ্বরটীতে যথা সময়ে ক্ষুধার উদ্রেক হইত না! শুনিতে পাই—রমানাথ খুড়ীমার অষ্টম গর্ভের সন্তান। সুতরাং রমানাথের চরিত্র যে অমানুষিক গুণ-সম্পন্ন তাহা আর বিচিত্র কি? বাল্যকাল হইতেই রমানাথের দেব প্রতিভার পরিচয় পাড়ার লোকে জানিতে পারিল। ভাগ্যবান্ ষণ্ডামার্কের কাছে—প্রহ্লাদ বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়া, ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথমাক্ষর "ক"—দেখিবামাত্র, তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া পড়ে; পৌরাণিক উপাখ্যান পাঠ করিলে—ইহা আমরা জানিতে পারি। আমার কাকার ছেলেটিও প্রহ্লাদের দ্বিতীয় এডিসন বিশেষ! কেননা গুরুমহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও রমানাথকে "ক" শিখাইতে পারেন নাই। "ক" দেখিলেই ছেলে কাঁদিয়া উঠিত, বেগতিক বুঝিয়া "ষণ্ডামার্ক" রূপী গুরুমহাশয় আমার কাকারূপী "হিরণ্যকশিপুকে" ছেলের গুণের কথা বলিলেন। বিরক্ত হইয়া কাকা দ্বিতীয় শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিলেন! কিন্তু সে লোকটা বড়—বেয়াড়া বেসুরো বদরসিক, সে একদিন কিনা "সোনার গোপালের পীঠে বেত মারিয়া দাগ্ড়া দাগ্ড়া" করিয়াছিল। খুড়ী-মা ইহা সহিতে পারিবেন কেন? তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি প্রকৃতই—"রত্ন-গর্ভা।" পার্থিব গুরুমহাশয়দের এমন বিদ্যা নাই যে তাহারা রমানাথকে

লেখাপড়া শিখাইবে। কাজেই সেই দিন হইতে রমানাথ পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রমানাথের অবতারত্ব প্রচার হইতে লাগিল; খুড়ী মা বলিতেন "আমার ছেলের মতন সাদা মন কারো নাই।" পাড়ার লোকে ক্রমশঃই তাহার পরিচয় পাইল! সুবিধা পাইলেই রমানাথ প্রতিবাসীদের—এটা সেটা লইয়া আসিতে লাগিল! যে পরের দ্রব্য আপনার মত ভাবে, তা'র মন যে সাদা, তাহার আর সন্দেহ কি?

ক্রমে যৌবনাবস্থায় "রমানাথ" ব্রজলীলায় মন দিলেন! "গোবর্দ্ধণ ধারণ" না করিতে পারিলেও—"গাপিনী হরণে" রমানাথের বেশ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল! গৃহস্থের বৌ-ঝী বাহির হইতে সাহস করিত না, কেননা রমানাথের রসিকতায় তাহারা অস্থির হইয়া পড়িত! অবশেষে—একটী বিধবা ডোমকন্যার প্রতি রমানাথের করুণা হইল। এখন সে রমানাথের রক্ষিতা। আহা 'রমানাথের তো উঁচু নজর নাই, জাতিভেদে, "কেশব সেনের" উপরেও—রমানাথ টেক্কা দিয়াছেন।

ডাইরুল সাহেব—বানরকে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, একথায় আমার খুব বিশ্বাস! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি—রমানাথের চরিত্রে তোমরা বানরের প্রকৃতি দেখিতে পাইবে।

বিবাহ দিলে ছেলের স্বভাব সংশোধিত হইবে, আমার কাকার ইহা ধারণা ছিল। তিনি চক্রবর্ত্তীতের বিনীর সঙ্গে রমানাথের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। বিনীর পিতা রামহরি চক্রবর্ত্তী—অতি দরিদ্র, তাঁহার কন্যাটীও সুশ্রী নয়, কাজেই অনিচ্ছা সত্বেও—রামহরি রমানাথকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইলেন।

যে ১৫ই তারিখে আমার বিবাহের কথা ছিল, সেইদিন রমানাথের বিবাহেরও দিনস্থির হইয়া গেল। কিছু অর্থ সংগ্রহের আশায়—রামহরি চক্রবর্ত্তী শিষ্যবাটী যাত্রা করিলেন।

কাকার ছেলেরও গাত্র হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে কাকা প্রকাশ করিলেন—"রামহরির মেয়ের সঙ্গে আমি রমানাথের বিবাহ দিব না।"

শিষ্য বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ কথা শুনিলেন। সর্ব্বনাশ! মেয়ের যে গাত্র হরিদ্রা হইয়াছে; পরশ্ব দিন বিবাহ, এখন বরের পিতা বাঁকিয়া বসিল? চক্রবর্ত্তীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! তাঁহার যে অবস্থা তাহাতে তিনি অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া অন্য পাত্রের চেষ্টা করিবেন, তাহা অসম্ভব। এত শীঘ্র পাত্রই বা কোথায় মিলিবে? ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণ "ত্রাহী মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া—শেষে কাকার হাতে পায়ে ধরিলেন—কত কাঁদিলেন—বলিলেন—"মহাশয়! বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, আর দিন নাই, মেয়ের গায়ে হলুদ দিয়াছি, এ-সময় আপনি পুত্রের বিবাহ দিতে অমত করিলে, আমি যে মারা যাই। দোহাই আপনার, এ বিপদে আমায় রক্ষা করুন, আমার জাতি মারিবেন না।"

ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে কাকা কর্ণপাত করিলেন না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "আমি না বুঝিয়া সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, আপনার মেয়েটা কালো, আমার ছেলে তা'র বন্ধুদের কাছে ব'লেছে যে সে কালো মেয়ে বিবাহ করিবে না। কি করিব বলুন, আমি অন্য মেয়ে স্থির ক'রে এসেছি; ১৫ই তারিখেই তারা বিবাহ দিতে প্রস্তুত! এখন আর কথার নড়চড় কেমন করিয়া করিব?"

শুনিতে পাই—এই কালোর জন্যই—কাকা কতদিন রামহরির কাছে উমেদারী করিয়াছিলেন!

এদিকে লোকমুখে আমরা শুনিতে পাইলাম—আমার সঙ্গে যে মেয়েটীর সম্বন্ধ হইয়াছিল, কাকা সেই মেয়েটীরই সঙ্গে রমানাথের বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছেন। বিবাহ ঐ ১৫ই তারিখেই হইবে। আমার

বেলায় যে মেয়ে.বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে—বিধবা হইবার কথা ছিল, নিজের ছেলের বেলায়—জ্যোতিষীর সে কথায় কাকার বিশ্বাস হয় নাই।

একজন বিশ্বস্ত প্রতিবাসীর মুখে প্রকাশ পাইল, যে মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ হইত, কাকা তাহাদের বাটীতে গিয়া পূর্ব্বদিন বলিয়া আসিয়াছেন—“গণেশের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দিও না। তাহার কোষ্ঠিতে লেখা আছে—বিবাহের ছয় মাসের ভিতর সে স্ত্রীর মাথা খাইবে।” আমার কোষ্ঠী তখনো কাকার কাছে ছিল, কন্যাপক্ষ তাহা দেখিল। তাদের কন্যারও যে অচিরে বিধবা হইবার সম্ভাবনা, একথা কাকা তাহাদের বলেন নাই। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া আমার মত রাক্ষসাবতারকে কেন তাহারা কন্যা সম্প্রদান করিবে?

বলা বাহুল্য—আমি যে একজন চূড়ান্ত বদ্‌মাইস্—কন্যাপক্ষকে এ কথাও কাকা বলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের গুণগাণ করিতে ক্রুটী করেন নাই।

কন্যার গাত্র হরিদ্রা দিয়া—কন্যাপক্ষ ফাঁফরে পড়িয়াছিল; এখন বিবাহ না দিলে সমাজে মুখ দেখানো ভার! কাজেই কাকাকে আর বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কন্যাপক্ষ কাকাব কথায় মুগ্ধ হইল, রমানাথকে কন্যা দান করিতে স্বীকৃত হইল।

কাকা পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—“গণশা পোড়ার মুখোকে তা’রা মেয়ে দিবে কেন? তা’রা আমাকেই ধরেছে! রমানাথকে দেখে তাদের বড় পছন্দ হয়েছে!”

এতক্ষণে কাকার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম। হায়! কাকা! নরকের কোন্ আততায়ীতায় বসিয়া পুঞ্জীকৃত পাপরাশির উপাদানে বিধাতা তোমাকে গঠন করিয়াছিলেন? তুমি কি মানুষ? ছি ছি! সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের হৃদয় কি এইরূপ অপবিত্র?

যে হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অসংখ্য জঘণ্য বৃত্তি দেদীপ্যমান,

—সে হৃদয়কে যদি মনুষ্য বলিতে হয়, তাহা হইলে পশুর সঙ্গে প্রণয় করা কি শ্লাঘনীয় নয়।

কোথায় কবি কালিদাস। তোমার সর্ব্ব প্রবেশক সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর অদ্বিতীয় প্রতিভা—আমার কাকার চরিত্র ফুটাইতে পারে কি? কখনই নয়। পৃথিবীর ভাষায় যে আজিও তেমন শব্দ দেখিতে পাই না। পাঠক, অবশ্যই তোমার পদার্থবিদ্যা পড়া আছে। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্—পদার্থ এই তিন রকম; কিন্তু আমার কাকাকে—তুমি এই ত্রিবিধ পদার্থের ভিতর পাইবে না, কাকা পদার্থের অতীত—অর্থাৎ অপদার্থ। আজ যদি চাণক্য পণ্ডিত বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে—এই কাকারূপী মহাপুরুষের কাছ থেকে লক্ষ হস্ত দূরে থাকিবার ব্যবস্থাটা করিয়া লইতাম।

আমার বাটীর উৎসবটা কাকার বাটীতে হইতে লাগিল। চক্ষের উপর সমস্তই দেখিতে লাগিলাম।—বলিতে পারিনা—মাঙ্গলিক "সানাই" ভৈরবীর ঝঙ্কারে—রমানাথের জন্য কোন অনাগত অমঙ্গলকে ডাকিতে ছিল কি না?

[৬]

কাকার উপর মা বড় চটিলেন। তিনি বড় সাধে পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, জ্যোতিষী তাহাতে বাদ সাধিল। কাকা আমার সেই মেয়েটীকে—আপনার ছেলের জন্য স্থির করিয়াছেন; এই জন্যই কাকার উপর মা'র রাগ। তা'র উপর যখন তিনি শুনিলেন—কাকা আমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে—তখন তাঁহার ধৈর্য্য লোপ হইল! ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মা একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—"যেমন করিয়া হউক—ঐ ১৫ই তারিখেই গণেশের বিবাহ দিব! তোমরা যেমন তেমন হ'ক্. একটা মেয়ে দেখ।"

পরম্পরায়—মা'র এই জেদের কথা—রামহরি চক্রবর্ত্তী শুনিতে পাইলেন। তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়া মা'র কাছে করজোড়ে বলিলেন, "আজ গরীব ব্রাহ্মণ আপনার শরণাগত, আপনি আমার বিনীকে চরণে স্থান না দিলে, আমার জাতি যায়; আপনি বিনা—আমার আর উপায় নাই।"

মা আমার করুণাময়ী। মা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। একথা শুনিয়া—আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যুৎ ছুটিল; হৃদয়ে সমুদ্র মন্থন হইতে লাগিল। যে বিনীকে আশৈশব ঘৃণা করিয়া আসিতেছি—সে আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে? অহো প্রকৃতি! তোমার কি অলঙ্ঘ্য মহিমা!!

ভাবিলাম—মা'র পায়ে ধরিয়া—এ সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করি; কিন্তু হায়! তাহাতো পারিলাম না! ঐ যে—মা আমার কোমর বাঁধিয়াছেন! ভাবী পুত্রবধূ বিনীর জন্য—ঐ যে মা' হৃদয়ের সমস্ত একাগ্রতাটুকু ঢালিয়া দিয়াছেন! আবার তাঁহার সেই আগ্রহ! সেই উৎকণ্ঠা! তাঁহার হৃদয়ের সে ভাব কেমন করিয়া আমি বর্ণনা করিব? আমি ক্ষীণবুদ্ধি মানব, আমার তো সেই বিশ্ববিজয়ী প্রতিভা নাই, মা'র হৃদয়ের আকুল আগ্রহ কেমন করিয়া আমি বুঝাইব?

পারিলাম না—মা'কে বারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া আমার হৃদয় যেন কেমন করিয়া উঠিল! সে হৃদয়ের নৈরাশ্যের যন্ত্রণা—সমস্তই যেন চ'ক্ষের উপর দেখিতে পাইলাম। আর কি পারি? উৎসাহ স্রোতে বাধা দিতে আর কি সাহস হয়? মা'র সে আনন্দময়ী-মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিলাম,—"মা! এই জন্যই তুমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

বিনা বাধায়—বিনীর সঙ্গে আমার বিবাহ ধার্য্য হইয়া গেল। যূপ-বদ্ধ ছাগ শিশুর মত আমি ঘাতকের অস্ত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

[৭]

আজ ১৫ই বৈশাখ। আজ আমার বিবাহ। সাধ করিয়া মা একদল "ব্যাণ্ড" আনাইয়াছেন; আজ তাঁহার আনন্দ দেখে কে? আমাদের সপ্তগ্রামটী তোলপাড় হইতে লাগিল। কুটুম্বের কুটুম্ব পর্য্যন্ত আমদানী হইল! বাড়ীতে আর জায়গা হয় না। দরিদ্রেরা পেট পুরিয়া প্রসাদ পাইল। পর্ব্বত প্রমাণ অন্নরাশি—চ'ক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে উড়িয়া গেল; বরযাত্রী ভদ্রলোকদের দন্ত ও জিহ্বায়—রসগোল্লা ও সন্দেশের রাম রাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল! পায়সের জল প্লাবনে—কত ব্রাহ্মণের সমস্ত দেহই ডুবিল—কেবল প্রমাণের জন্য টীকিটী মাত্র জাগিয়া রহিল! মা'র আজ বিরক্তি নাই - যে' যা' চাহিতেছে সে' তাই পাইতেছে! প্রতিবেশিনী রমণীদের হুলুধ্বনি - শ্রোতার কর্ণে বীরক্ষেত্রের সিংহনাদের শব্দ জাগাইয়া তুলিল।

ঠিক্ সন্ধ্যার সময়—সাঁচ্চার পোষাকে সাজিয়া, ফুল ভূষণে ভূষিত হইয়া, তাঞ্জাবে চড়িয়া,—শ্রীমান্ গণেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বরবেশে বাহির হইলেন। খাস্ গ্লাসের আলোকে পল্লীপথ উজ্জল হইয়া উঠিল। করনেট্, ক্লারিনেট্—অলথর্নের ঐক্যতানে—ক্ষুদ্র গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

মেয়ে মহলে সাড়া পড়িল। যুবতীদের মাথার টনক নড়িল। তাহারা আমায় কতবার দেখিয়াছে, তথাপি আজ বর দেখার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। কেহ ভাত রাঁধিতেছিল, ড্রামের শব্দ তাহার শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, হাঁড়ী উনানের উপর বসানো রহিল, সে ছুটিয়া পথের ধারে দাঁড়াইল। কোন রসিকা স্বামীকে ভাত দিয়া তরকারী দিতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় তিনি "শ্যামের বাঁশীর" ন্যায় এই ড্রামের আওয়াজ পাইলেন, স্বামী ও তরকারী উভয়ই ছাড়িয়া তিনি একেবারে

পথের উপর আসিলেন। স্বামী বেচারা আধখানা আলু মুখে করিয়া বিকট বিরহ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কোন যুবতী দুধের ছেলে-টাকে ঘুম পাড়াইতেছিলেন, তাঁহার কাণে বাঁশীর শব্দ প্রবেশ করিল; পোড়া ছেলে কিছুতেই ঘুমায় না, উপায়ান্তর না দেখিয়া যুবতী সেই ছেলের গালে—বিরাশী সিক্কার একটী চপেটাঘাত করিয়া, বর দেখিতে ছুটিলেন। ছেলে—সপ্তসুরে তিনগ্রামে—ছয়রাগে—ছত্রিশ রাগিণীতে—মুখব্যাদন করিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

এইরূপে শ্যামী, বামী, ন্যারাণী, ভূতি প্রভৃতি গ্রাম্য যুবতীরা—সকলেই বর দেখিতে আসিল। তাহাদের কটাক্ষ আকর্ষণ করিয়া—আজ আমি বিবাহ করিতে চলিলাম।

শুভলগ্নে শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর পাণি গ্রহণ করিলাম। পুত্রবধূ পাইয়া মা বড় আনন্দিতা হইলেন। মহাসমারোহে "পাকস্পর্শ" চুকিয়া গেল। বলা বাহুল্য কাকার ছেলেও বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

[৮]

বিনীর উপর আর আমার ঘৃণা নাই। এখন শ্রীমতী বিনোদিনী—আমার গৃহিণী। কালো হইলেও—বিনোদিনী নারীরত্ন। তাহাকে দেখিলে—আমার বুকের ভিতর একটা প্রেমের তাড়িত বহিয়া যায়। আর বিনোদিনী? আমাকে পাইয়া সে আত্মহারা।

আমার প্রতি তা'র যত্ন ও ভালবাসার সীমা নাই। নিদাঘ তাপিত পথিকের পক্ষে, বটচ্ছায়া, সুশীতল পানীয়, এবং কুসুম-শয্যা—যেমন আকাঙ্ক্ষার জিনিষ, বিনোদিনীও তেমনি।

প্রাবৃটের বিজলীর মত—বিনোদিনীর রূপে আমার ক্ষুদ্র গৃহটী আলো-কিত। এখনো ছয় মাস হয়নি—বিনোদিনী আমার গৃহে আসিয়াছে, ইতিমধ্যেই সে আমায় অন্তরের অন্তর হইতে চিনিয়া লইয়াছে। বিনো-

দিনীর হৃদয়টীতে—প্রেমের প্রস্রবণ! পুরাণে বলে—মহাদেব নাকি বিষপানে কাতর হইয়াছিলেন, তাই বিধাতা বিষকে কোন সুদূরে লুকাইয়া, আমার এই বালিকা স্ত্রীটীর হাঁসিমাখা মুখখানি সুধামাখা করিয়াছেন ?

কবি ভারতচন্দ্র ! তুমি রমণী নিতম্বকে—মাটীর মেদিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছ। কিন্তু বিনোদিনীর কাছে তোমার ও তুলনায় বাহাদুরী নাই। বিনোদিনীর নিতম্ব দেখিয়া আমি মাটী হইয়া গিয়াছি।

একদিন রাত্রে—বিনোদিনী ও আমি শয়ন করিয়া আছি। হঠাৎ বিনোদিনী—বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিল। আমার তখন তন্দ্রা আসিয়াছিল, বিনোদিনীর গৃহ প্রবেশে সেটুকু ভাঙ্গিয়া গেল! চাহিয়া দেখিলাম—বিনোদ মাটীতেই আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

বিস্মিত হইয়া তাহাকে বিছানায় উঠিতে কহিলাম। সে বলিল,—"পেটটা ভালো নয়, এখন আর বিছানায় যাইব না, আবার হয়তো এখনি বাহিরে যাইতে হইবে।" বলিতে বলিতে বিনোদিনী আবার বাহিরে গেল। যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম তাহার সে ঢলঢল ভাব যেন আর নাই। বালিকার সুকুমার দেহ—যেন ছয় মাসের রোগীর মত নীলাভ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন মধ্যাহ্নে মাসী-মা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভোজনটা গুরুতরই হইয়াছিল, ভাবিলাম সেইজন্যই বিনোদিনীর এরূপ হইয়াছে। আমার কাছে "হোমিওপ্যাথী" বাক্স থাকিত। এক ফোঁটা "পল্‌সেটিলা" বিনোদিনীকে খাওয়াইলাম। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, বিনোদিনীর রীতিমত ভেদ বমি আরম্ভ হইল !

মাকে ডাকিলাম। ডাক্তারকেও সংবাদ দিলাম। দুই তিনজন ডাক্তার আসিয়া কত ঔষধ পরিবর্তন করিলেন, কোন উপকার হইল না।

রোগিণীর শরীর ক্রমে শীতল হইয়া আসিল, চৈতন্যও লোপ পাইল, আমার উৎকণ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর! আমি আর রোগীর গৃহে বসিতে পারিলাম না, নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম।

তখনই একটা কান্নার রোল আমার কাণে গেল! উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বৈঠকখানা ছাড়িয়া অন্দরাভিমুখে ছুটিলাম। উপরে উঠিতে যাইতেছি—এমন সময় দেখিলাম—মা কাঁদিতে কাঁদিতে নামিয়া আসিতেছেন, আমাকে দেখিয়া তিনি আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

রোদনের কারণ আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, বাকৃশক্তি রহিত হইয়া গেল। পাগলের মত আমি বসিয়া পড়িলাম! হায়! আজ বিনোদ আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে।

ক্রমে লোক জনজড় হইল, বিনোদিনীর দেহ উঠাইল, মা'র চীৎকার ধ্বনি আরো প্রবল হইল! তখন আমার মনের ভিতর যে কেমন করিতে লাগিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? হৃদয়ে একরাশি অন্ধকার লইয়া—উদাসপ্রাণে আমি শবদেহের অনুগমন করিলাম।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে। সৎকার করিয়া আমরা ফিরিতেছি, হঠাৎ কাকার বাটীতে রোদনের রোল শুনিতে পাইলাম। আমরা যে সময়ে কাকার বাটীর দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, সেই সময় একজন প্রতিবাসী কাকার বাটী হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম—"আজ রাত্রি ৯টার সময় রামনাথকে সাপে কামড়ায়, অনেক ঝাড়ান ঝাড়নেও ফল হয় নাই। ঠিক আড়াইটা রাত্রির সময় রমানাথ প্রাণ হারাইয়াছে।"

আমার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। কি আশ্চর্য্য! জ্যোতিষী তবে তো ঠিক গণনাই করিয়াছিল! বাটীতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রেই হিসাব করিয়া দেখিলাম—অদ্য আমাদের বিবাহের ছয় মাস পূর্ণ হইয়াছে!!

সৌদামিনী।

(গল্প)

(১)

চোদ্দ বছরের মালতী, ছোট খাট, নিটোল, পরম রূপসী। মালতীর ছোট মাথায় কাল রেশমের মত কুঞ্চিত কেশরাশি পৃষ্ঠে আলুলায়িত; কর্ণে দুল,—মেঘ মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় খেলিতেছে! মালতীর বিমাতা সৌদামিনী, ষোড়শ বর্ষে স্বামী রত্নকে করাল কালের কবলে নিক্ষেপ করিয়া, আজ সর্ব্বে সর্ব্বা গিন্নী।

মালতীর পিতা জীবিতাবস্থায় মালতীকে বৈদ্যবাটীর গয়লাপাড়ার নরেন্দ্রের সহিত শুভ বিবাহ দিয়াছিলেন।

মালতীর পিতার হস্তে প্রচুর ধন সম্পত্তি ছিল, তিনি কন্যা সম্প্রদান সময়ে বহু অর্থ যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে মালতী শ্বশুরালয়েই থাকিত। বিমাতার সহিত মালতীর বড় একটা সদ্ভাব ছিল না; বিমাতাকে মালতী "বৌ-মা" বলিয়া ডাকিত।

সৌদামিনী এখন গৃহকর্ত্রী, বাটীতে কেবল একজন দাসী থাকে। সৌদামিনী অষ্টাদশ বর্ষীয়া, সুরসিকা, সুরূপা। কখন কখনও সৌদামিনী গীত গাহিত, কার্পেটের উপর রেশমের লতা পাতা তুলিত, সময়ে সময়ে দুই এক খানা সংবাদ পত্রে, প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিত।

সৌদামিনীর বাটীর পার্শ্বস্থিত যুবক প্রিয়নাথ, সুশিক্ষিত, সুপুরুষ ও সুরসিক। প্রিয়নাথের সংসারে মাতা, পুত্র গোপালচন্দ্র ও একজন দাসী। গোপালচন্দ্রের জননী পূর্ণ যৌবনে একমাত্র পুত্রধনে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অষ্ট বিংশ বর্ষীয় প্রিয়নাথ আর বিবাহ করিল না, দাসত্ব করিয়া সুখে দুঃখে সংসার চালাইত।

* * * *

সৌদামিনী গভীর নিশীথে, দ্বিতলস্থ শয়ন মন্দিরে, উন্মুক্ত গবাক্ষ সন্নিধানে বসিয়া সুদূর দিগন্তব্যাপি, সুনীল গগণোপরে সুধাংশুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কত কি ভাবিত; ভাবিতে ভাবিতে কখনও হারমোনিয়াম্ বাজাইয়া পঞ্চমে হৃদয়োচ্ছ্বাস তুলিত। সৌদামিনীর সুললিত কণ্ঠে সুমধুর গীত নির্জ্জন নিশীথে অভাগা প্রিয়নাথকে জ্বালাইত।

শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রিয়নাথ্ ছাদের উপর আসিয়া, নির্নিমেষ নয়নে সৌদামিনীর কক্ষ প্রতি চাহিয়া, একমনে সে গীত, সে মধুর ঝঙ্কার, সে কাকলিপূর্ণ মূর্চ্ছনা শুনিত। মালতীর স্বামী নরেন্দ্র, প্রতি সপ্তাহে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া যাইত, তাহার বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিত, রবিবার প্রাতে আসিয়া সায়হ্নে চলিয়া যাইত।

সৌদামিনী রাত্রে থাকিবার জন্য তাহাকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু নরেন্দ্র, নানারূপ অছিলা করিয়া থাকিত না।

নরেন্দ্র সুশ্রী, বলিষ্ঠ, জ্ঞানবান্, শান্ত, মিষ্টভাষী ; নরেন্দ্রকে দেখিলে সকলেরই ভালবাসিতে সাধ হয়।

দীর্ঘ একবৎসর কাল গভীর রজনীতে, সৌদামিনীর করুণ উচ্ছ্বাসে, দিবারাত্র সৌদামিনীর চিন্তায়, প্রিয়নাথ আত্মহারা, কর্ম্মে অমনোযোগী, কর্ত্তব্যে উদাসিন, শরীরে দৃষ্টি নাই ; আহারে রুচি নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সৌদামিনী ছাদের উপর বসিয়া, সুনীল গগণের অপূর্ব্ব শোভা, প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, বিশ্বের অতুলনীয় রূপরাশি দেখিত। সৌদামিনীর দর্শনাশে প্রিয়নাথ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাদে উঠিয়া, স্থিরভাবে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিত। সময়ে সময়ে তাহার সহিত সৌদামিনীর চক্ষের মিলন হইত, এরূপ হইলে সৌদামিনী কখন মাথায় কাপড় দিয়া সরিয়া যাইত ; কখনও বা তাহাকে দেখিয়া নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি দেখাইয়া একটু

মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া পলায়ন করিত। তাহা দেখিয়া প্রিয়নাথ তাহাকে দেখিবার জন্য আরও আকুল হইয়া পড়িত। অবশেষে প্রিয়নাথ সকল প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রখর রৌদ্রে, প্রবল বৃষ্টিতে, গভীর অন্ধকার নিশীথে, ছাদের উপর বসিয়া সৌদামিনীর কক্ষপ্রতি চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে ক্রমে প্রিয়নাথের সংসারে দারিদ্র-রাক্ষসী আসিল, প্রথমে গরু বাছুর বিক্রয় হইল, মধ্যে দাসী তিরোহিতা হইল, সর্ব্বশেষে ঋণ আরম্ভ হইল। সৌদামিনী এ সংবাদ শুনিয়া, মনে মনে হাসিয়াছিল।

(২)

প্রিয়নাথের সংসারে কমলা থাকিতে পারিল না, অলক্ষ্মীকে রাখিয়া তিনি গৃহের বাহির হইলেন। সংসারও অচল হইল, অষ্টম বর্ষীয় গোপালচন্দ্র এক বেলা খাইতে পায়, এক বেলা পাইত না; গৃহের তৈজসাদি একে একে বিক্রীত হইয়াছে। ২।১ শত টাকা কর্জ্জও হইয়াছে; অবশেষে প্রিয়নাথ উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইল।

প্রিয়নাথের বৃদ্ধা জননী পুত্র, পৌত্রের জন্য ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে এক মুঠা জুটাইত।

প্রিয়নাথ উন্মাদ হইলে এখনও সৌদামিনীকে দেখিবার জন্য ছাদে উঠিয়া বসিয়া থাকিত!

গোপালের অবস্থা আরও মন্দ হইল, একমাত্র পিতামহী দারুণ রোগাক্রান্ত-হইয়া বিনা চিকিৎসায় দুঃখ কষ্টের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

মাতৃহীন—দুর্ভাগ্য গোপালচন্দ্রকে নরেন্দ্র কৃপা পরবশে আপন বাটীতে আনিয়া তাহার প্রতিপালন করিতে মনস্থ করিল।

প্রিয়নাথ উপস্থিত পাগলা গারদে আছে।

অকস্মাৎ একদিন সৌদামিনীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া বলিয়া নরেন্দ্রকে

টেলিগ্রাফ করা হইল। মালতী পূর্ণ গর্ভবতী, সেইজন্য তাহাকে সঙ্গে না লইয়া নরেন্দ্র একাই শ্বশুরালয়ে আসিল।

নরেন্দ্র আসিয়া দেখিল, সৌদামিনীর পীড়ার চিহ্ন কিছুই নাই, তবে শুনিল তাহার বুক সর্ব্বদাই ধড়ফড় করিতেছে, প্রাণটা যেন কোথায় ছুটিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সৌদামিনীর বুক গেল, বুক গেল, রোগটা আরও বৃদ্ধি পাইল, নরেন্দ্র সাগ্রহে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী অতি কষ্টে, কম্পিত হস্তে মস্তকে ঈষৎ কাপড় টানিয়া দিল, দাসী গোবরার মাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "তুই শীঘ্র জামাই বাবুর বিছানা, আমার ওপাশের খাটে করিয়া দিয়া, তোর কাজ-কর্ম্ম সারিয়া আয়।"

গোবরার মা, পাখা রাখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, এক দৌড়ে সুন্দর শয্যা পাতিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

সুসজ্জিত গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে, শয্যার উপর নরেন্দ্র বিষন্ন মুখে উপবিষ্ট। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ হইতে শশধরের স্নিগ্ধ মধুর জ্যোতিঃ সৌদামিনীর বুকে মুখে পড়িয়াছে। দুরন্ত বসন্তানীল ছুটিয়া আসিয়া ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকাদাম সৌদামিনীর নিটোল, ছোটখাট কপালে ও অধরের চারি পাশে বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

নরেন্দ্র সে চিত্র, সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। সৌদামিনী কিছুক্ষণ পরে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। নরেন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, সৌদামিনী তখন শয্যায় শায়িতাবস্থায় এপাশ ওপাশ করিতেছিল, দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর সন্নিবদ্ধ, পরিধেয় বসন অরক্ষিত।

নরেন্দ্র কক্ষ হইতে দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া দাসীকে ডাকিল, কিন্তু কাহারও শব্দ পাইল না, অগত্যা সৌদামিনীর নিকটস্থ হইয়া, সে তাহার বক্ষের উপর আপন উত্তরীয় ফেলিয়া দিল।

ক্ষণপরে সৌদামিনী প্রকৃতিস্থ হইয়া নরেন্দ্রের সমীপবর্ত্তিনী হইল, তাহা দেখিয়া নরেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল, শয্যা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিবে এমন সময়ে সৌদামিনী তাহাকে সবলে টানিয়া শয্যায় বসাইল।

বহু চেষ্টা, প্রাণপণ বল প্রয়োগ করিয়াও নরেন্দ্র সৌদামিনীর বন্ধন শিথিল করিতে পারিল না।

অবশেষে আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত-হইয়া সৌদামিনী উন্মাদিনীর ন্যায় নরেন্দ্রকে ধীরে ধীরে নতমুখে বলিল,—"অভাগিনী, অনাথিনী, পতিহীনা, দুঃখিনী আজ লাজ, মান, জলাঞ্জলি দিয়া সকাতরে তোমার নিকটে এক বিন্দু তৃষ্ণার জল চাহিল; তুমি নির্দ্দয়, নির্ম্মম, ফিরিয়াও চাহিলে না; আজ আমার শেষ চেষ্টা, হয় আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর, নয় তোমার ঐ সুকোমল হস্তে আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাইয়া দাও।"

(৩)

তখন নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নানারূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দান করিল, সৌদামিনীর সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, সৌদামিনীর কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইল। জগতে বিধবাদিগের স্থান কোথায় এবং তাহাদিগের আদর্শ চরিত্রে তাহাদিগের কন্যা, ভগিনীগণ যে স্বীয় চরিত্র গঠন করিবে ইহাও বলিল। শুনিয়া সৌদামিনী প্রকৃতিস্থ হইল—করযোড়ে নরেন্দ্রের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা চাহিল—এবং নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য তখন মনে মনে শত শত বার ধিক্কার দিতে লাগিল। হায় সৌদামিনি! এ নশ্বর সুখমোহে মোহিত হইয়া তুমি এ কি করিতে বসিয়াছিলে? ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও যে, জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্র আজ তোমার সমীপে ছিল—নচেৎ তুমি আজ যাহা হারাইতে—তাহা ইহ জন্মে শত চেষ্টা করিয়াও আর ফিরিয়া পাইতে না; জগতে নারী-ধর্ম্ম রক্ষা করা অতীব সুকঠিন। অয়ি মাতৃস্বরূপিণী বঙ্গললনাগণ! তোমরা তোমাদিগের

স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যত্নবতী হও, তোমাদের অমূল্য রত্ন তোমরা হেলায় হারাইও না,—এই রত্নের প্রভায় আজও তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বরণীয়া,—সামান্য অনবধানে এ অমূল্য রত্নের প্রভাহীন হয়। আর হে ভ্রাতৃস্থানীয় যুবকবৃন্দ! তোমরা নরেন্দ্রের ন্যায় মনের বলে, সৌদামিনীর ন্যায় অভাগিনী রমণীর মতিগতি ফিরাইয়া দাও;—বাঙ্গালায়—ভারতে—বঙ্গ-রমণীবৃন্দের শোচনীয় অধঃপতন আমাদিগের জাতীয় কলঙ্কস্বরূপ তাহা একবার সকলে স্মরণ রাখিও।

প্রিয়নাথ আরোগ্য হইয়া পাগলাগারদ হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে; নরেন্দ্র এক্ষণে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইয়াছে। সৌদামিনীর গুপ্ত কথা নরেন্দ্র কাহাকেও ব্যক্ত করিল না। কিন্তু সৌদামিনী নিজের স্বভাব ছাড়িতে পারিল না, আবার পূর্ব্বের ন্যায় ছাদে উঠিতে লাগিল—আবার প্রিয়নাথের সহিত সেইরূপ দর্শন দান করিল। এক সন্ধ্যার সময় প্রিয়নাথ সৌদামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রেম ভিক্ষা করিল, সৌদামিনীর তখন নরেন্দ্রের উপদেশাবলী স্মরণ হইল, সে সেই মুহূর্ত্তের জন্য প্রিয়নাথকে উপেক্ষা করিয়া শত শত বার ধিক্কার দিল, প্রিয়নাথ তাহার কথায় যেন মরমে মরিয়া রহিল।

সৌদামিনীর পাপ পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইলেই নরেন্দ্রের ব্যবহার মনে করিত, বার বার নরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া অবশেষে সে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল—তাহার অস্তিত্ব ধরাতল হইতে বিলুপ্ত করিতে প্রয়াস পাইল।

প্রিয়নাথ উপেক্ষিত হইয়া, প্রত্যহ সৌদামিনীর গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিল। নরেন্দ্রের অনিষ্ট কামনায় একদিন সৌদামিনী মালতীকে নিজ বাটীতে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল, নরেন্দ্র তাহাকে পাঠাইল না, ইহাতে সৌদামিনী, দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে অধীরা হইল; এক শেষ নিশায় দাসী সহ, সৌদামিনী স্বয়ং নরেন্দ্রের বাড়ীতে যাত্রা করিল।

বেলা দশটার সময় সৌদামিনী দাসী সহ নরেন্দ্রের বাটীতে পৌঁছিল। মালতী বিমাতার চরণ ধূলি লইয়া বসিতে দিল, সৌদামিনীর আগমনে নরেন্দ্র ভীত হইল।

সৌদামিনীর আসিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রিয়নাথ আসিয়া নিভৃতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সৌদামিনীর ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিল। নরেন্দ্র সৌদামিনীকে তাহা জানাইল এবং পুনঃরায় নানারূপ উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বলিল।

(৪)

সৌদামিনীর কৌশল ব্যর্থ হইলে সে সন্ধ্যার পর দাসী সহ নরেন্দ্রের বাটী ত্যাগ করিল। পথি মধ্যে সহসা সৌদামিনীর পাল্কী থামিল, কারণ জানিবার জন্য সৌদামিনী দরজা ঈষৎ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পাল্কী থামিল কেন?"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথ দরজা খুলিয়া সবলে সৌদামিনীকে টানিয়া বাহির করিল; জ্যোৎস্নালোকে সৌদামিনী প্রিয়নাথকে চিনিল।

প্রিয়নাথ পথি মধ্যে সৌদামিনীকে টানিয়া আনিল,—বেহারাদের হাত পা বাঁধিয়া রাখিল,—গোবরার মা'র নাক কাটিয়া দিল।

সৌদামিনী তখন তাহাকে কত মিনতি করিল, অনুরাগ জানাইল, সোহাগ করিল, কিন্তু প্রিয়নাথ আর তাহার মোহে ভুলিল না,—দন্তে দন্ত নিস্পেষিত করিয়া বলিল,—"রাক্ষসি, তোমার জন্য আমার এই নবীন যৌবন, এই কোমল প্রাণ, মাতা পুত্র, গৃহ সমস্ত অতল জলে ডুবিয়াছে। তুমি আমার প্রেম উপেক্ষা করিয়া অন্যে আসক্ত, সন্তান তুল্য জামাতা, তাহার উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছ। তোমার মত শয়তানীর পরিণাম কি জান?"

সৌদামিনী জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, প্রিয়নাথের নয়নে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। প্রিয়নাথের বজ্রমুষ্টি, সৌদামিনীর বিলোল কটাক্ষকে ব্যর্থ করিয়াছে।

সৌদামিনী কতই কাঁদিল, কতই মিনতি করিল, কতবার প্রিয়নাথের চরণ ধরিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিল যে, সে প্রিয়নাথকে চিরকালের জন্য তাহার হৃদয়েশ্বর করিয়া রাখিবে। কিন্তু প্রিয়নাথ তাহার কথা শুনিল না,—সদর্পে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল; দারুণ পদাঘাতে সৌদামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার মুখ বন্ধ করিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "শয়তানি, তোমার ছলনায় আর ভুলিব না, আজ তোমার দুর্দ্দশার শেষ—জীবনের শেষ,—মৃত্যু শিয়রে—একবার ভগবান্‌কে ডাকিতে সময় দিলাম। একবার তোমার দুষ্কৃতি স্মরণ কর।" অতঃপর প্রিয়নাথ এক খানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সৌদামিনীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

এই ভীষণ সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গোবরার মা অতি কষ্টে দেশে আসিয়া, সমস্ত কথা সকলকে জানাইল, এবং আপনার দুর্দ্দশাও দেখাইল।

পুলিশে সংবাদ গেল, বহু অনুসন্ধানেও খুনী প্রিয়নাথের আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

* * * * *

সৌদামিনীর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মালতী পাইল। সে নরেন্দ্রের স্বভাব গুণে সকল প্রকার সুখভোগ করিতে লাগিল।

এখন গোপাল বড় হইয়াছে, নরেন্দ্র গোপালের বিবাহ দিয়া পৈতৃক বাটীতে রাখিয়াছে, গোপাল এখন স্বয়ং কর্ম্মক্ষম—দু'পয়সা বেশ আনিতে পারে।

কলিকাতা, ৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে
আব্দুল গোফুর দ্বারা মুদ্রিত।

ভিখারী

[প্রেমের চিত্র]

(১)

আমাদের বাটীর সম্মুখে রাস্তার উপর একটী ভিখারী প্রত্যহ বসিয়া থাকিত ; রাত্রি হইলে রোয়াকের উপর শুইয়া পড়িত। পাঠক, একজন ভিখারীকে লইয়া গল্পের আরম্ভ দেখিয়া বিরক্ত হইবেন না—আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিবেন ইহা কিরূপ কৌতূহলজনক।

আমি টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বেশ আরামে বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতাম। হাতে কাজ'না থাকিলে, ভিখারীটার দিকে, কি আকাশ বা কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। ভিখারীর স্বভাব এক আশ্চর্য্য রকমের। সে হাঁ করিয়া আপনার দুঃখ ভাবিত, কখনও আমার ঘরের দিকে চাহিয়া আমার নাকের উপর সোণার চসমা ও পায়ের বিলাতী জুতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিত। রাস্তায় লোক দেখিলে একবার হাত পাতিয়া কিছু চাহিত, না দিলে হাত গুটাইয়া লইত—কাহাকেও ব্যস্ত করিত না। এ এক নূতন রকমের ভিখারী নয় কি ?

(২)

সে দিন হাতে কোন কাজ ছিল না। নিস্তব্ধে একাকী বসিয়া আছি। জানালায় ভিজে খস্ খস্ ঝুলিতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না—খস্ খস্ টানিয়া দেখি রাস্তার ধারে ভিখারীটা বসিয়া রহিয়াছে। সে আমার মুখের দিকে তাহার মলিন, বিষাদ-

কালিমা লিপ্ত, উদাস মুখের দৃষ্টি স্থাপিত করিল—ক্ষণিকের নিমিত্ত। হৃদয়ে আমার কেমন কৌতূহল জন্মিল, ভিখারীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার নাম কি ?—বাড়ী কোথা ?—কেহ আছে ?”

ভিখারী একটু ম্লান হাস্য দ্বারা ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া বলিল, “হুজুর, এ দুঃখীর কথা জানিয়া আপনার কি লাভ হইবে ? আমার নাম শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু—বাড়ী এলাহাবাদে—বাড়ীতে আমার আত্মীয়-স্বজন সকলই আছেন।”

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। ভিখারী বলে কি ? সে কায়স্থ ? না—লোকটা মিথ্যা কথা কহিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কায়স্থাদি জাতি কখনও ভিখারী হইতে পারে না। এদিকে ভিখারী বলিতেছে, তাহার বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন সকলেই আছে, তবুও সে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এত কিসের দুঃখ ? হইতে পারে লোক-টাকে কোন দুষ্কর্ম্ম করার নিমিত্ত বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে ; যাহা হউক ভিখারীকে জিজ্ঞাসা করি, সে কি বলে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। “তুমি তা হ’লে—কায়স্থ ?”

ভিখারী আবার একটু হাসিয়া বলিল, “আজ্ঞা হাঁ, আমি কায়স্থ—আপনি দেখিতেছি বিশ্বাস করিতেছেন না—কেন—কায়স্থ কি দুঃখী হয় না ?”

ভিখারী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উভয় জানুর মধ্যে মস্তক দিয়া বসিয়া রহিল। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, “তোমার এমন অবস্থা কেন ?”

ভিখারী তাহার মস্তক তুলিয়া তাহার উদাস দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “সে অনেক কথা। আমার জীবন বড় রহস্যময়—বড় মর্ম্মান্তিক, তাহা শুনিলে আপনার মনে কষ্ট হইতে পারে, সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই।’

ভিখারীর প্রতি কথায় তাহার হৃদয়ের দুঃখ, বেদনা স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতেছিল। আমার কৌতূহল বাড়িল। জানালার নিকটে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া বলিলাম, "না, তোমাকে তোমার জীবনের সমস্ত কথা বলিতেই হইবে। সে কাহিনী যতই বিষাদময় ও মর্ম্মান্তিক হউক না কেন, তাহাতে আমার কোন কষ্ট হইবে না।"

(৵৩)

ভিখারী একবার আকাশের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। "আমার পিতা মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন। মা আমার আমাকে প্রসব করিয়া সূতিকা গৃহেতেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পিতা আমাকে শৈশব হইতে যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন—মাতার অভাব আমাকে জানিতে দেন নাই।

আমরা ভাই ভগ্নীতে তিনটী। দুইটী ভগ্নী আর আমি হতভাগ্য—কনিষ্ঠ। যখন আমার বয়স ২০ বৎসর, তখন আমি এফ্ এ, পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হওয়ায়, মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহাই গেল আমাদের পারিবারিক কথা। আমাদের বাড়ীর পাশেই যদু বাবুদের বাড়ী। তাঁহার একমাত্র কন্যা সুধাময়ী রূপে গুণে অতুলনীয়া।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলিলে যদু বাবুর কন্যা—নাম সুধাময়ী?"

ভিখারী কহিল, "হাঁ। তাঁহার একমাত্র কন্যা সুধাময়ী রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিল, বাল্যকালে যখন আমার বয়স আট বৎসর, আর সুধার পাঁচ বৎসর, তখন হইতেই আমরা একত্রে খেলা করিতাম। ভাল কোন জিনিষ পাইলে আগে সুধাকে খাওয়াইতাম—'পরে আমি খাইতাম। সুধাও আমাকে তেমনি ভালবাসিত। পাড়ার সকলে আমাদের দেখিয়া বলিত, 'আহা এরা যেন একমায়ের পেটের ভাই বোন্।' এবং যাহাতে

আমার সহিত সুধার বিবাহ হয় এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবার অনেকেই বলিতেন, এ "দুইজনের সঙ্গে বিবাহ হইলে বেশ মানাইবে।" কিন্তু তাহা হইল না। ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। সংসারে সকলে যদি আপনার ইচ্ছানুরূপ সকলই পায়, তাহা হইলে সংসার চলে না। এই বলিয়া ভিখারী চুপ করিল; তাহার উত্তর গণ্ড দিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

(৪)

ক্ষণপরে সে আত্ম সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"সুধা তাহার পিতার হৃদয়ের একমাত্র আদরের ধন ছিল, তাহার পিতা ধনবান্, সুধা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, তখন সে আর আমার নিকটে বড় একটা আসিত না। সুধার বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল, এখনকার কালে মূর্খ বা বিদ্বান, ধনী কি নির্ধন কাহারও বিবাহ বন্ধ থাকে না। আমার পিতা আমার বিবাহের নিমিত্ত পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি সুধা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে অসম্মত হইলাম। পিতা আমাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইলাম না। নিরুপায় হইয়া পিতা অবশেষে যদু বাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। যদুবাবু অসম্মত হইলেন।

সুধার বিবাহ অন্যত্র স্থির হইয়া গেল। আমিও হতভাগা হইলাম।

(৫)

ভিখারী আরও বলিল, "সুধার বিবাহের দু'দিন পূর্ব্বে আমি আমার গৃহের গবাক্ষ সমীপে বসিয়া আছি। নানা চিন্তা আসিয়া আমার অন্তঃ-করণ অধিকার করিয়াছিল, যেখানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে সুধাদের বাটীর বাগানের প্রায় সমস্তটা দেখা যায়। সেদিন পূর্ণিমার চন্দ্র হীরকখচিত নীলাম্বর বসনের মধ্যে উজ্জ্বল মণির ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া আসিতেছে। আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ জাহ্নবীবক্ষে প্রতি বীচি-

মালার উপর জ্যোৎস্না চঞ্চলা বালিকার ন্যায় খেলিয়া বেড়াইতেছিল। মানব যখন কোন কার্য্য সম্পাদন করে, সে তাহার পরিণাম চিন্তা করে না। আত্ম সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে কোন গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করে,—পরে আপনি আপনার কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ করে। আমারও ঠিক সেই দশা হইল। এখন মনে হয় কেন সুধাকে ভালবাসিয়াছিলাম। যদি তাহাকে না ভালবাসিতাম—তাহা হইলে, আমার পিতা—বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক পাইতেন না। হায়! না জানি তিনি এখন কিরূপ মনোকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। যাক্ সে কথা—যাহা বলিতেছিলাম বলি—আমি গবাক্ষ সমীপে বসিয়া আছি। সে রজনী বড় সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছিল। জ্যোৎস্নাবিধৌত চন্দ্রকরলেখাময় রজনীতে যখন পাপিয়া তাহার সুমধুর কণ্ঠের স্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া দিতেছিল—সেই সময় হঠাৎ রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ বিষাদ গীতি জাহ্নবীবক্ষ কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল :—

"রূপ দেখি বন্ধু তোহারি হাম মজিনু।
নেহি তোম আয়ল
কুলনারী মজায়ল
মুগধিনী হাম বালনারী কাঁহা তোম কানু॥"

সেই বিষাদময় গীতিতে আমার হৃদয়ের দুঃখ, বিষাদ প্রতি-কথায় যেন ব্যক্ত হইতেছিল। এ গান কে গাহিতেছে? সে কি আমার মত দুঃখী? কে গাহিতেছে জানিবার সাধ হইল। কিন্তু ক্রমে সেই গীতির শেষচরণ আকাশের প্রান্তে প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া গেল। তাহারই কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সুধা উদ্যানের মধ্যে বেড়াইতেছে। আমি সুধাকে দেখিয়া হতজ্ঞান হইলাম; এক লম্ফে বাগানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুধার সমীপস্থ হইলাম।

(৬)

সুধা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে বলিল, "দেবেন দাদা! তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?" সুধাকর তখন রজকগোলকবৎ আকাশের এক প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্না তরঙ্গে তখন পৃথিবী প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। আমি সুধার সেই বড় বড় চক্ষু—তদুপরি চিত্রোপম ভ্রূ—এবং সুন্দর নাসিকা ললাটদেশস্থ স্বেদবিতাড়িত চূর্ণ কুন্তলশোভিত ব্রীড়াবনতা মুখখানি দেখিতেছিলাম। আমি তখন আপনাকে ভুলিয়া গেলাম। সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল যেন কোন স্বপ্নময় অজানিত সুখের রাজ্যে আগমন করিয়াছি। সেখানে বুঝি কেবল সুখ—সুখ ভিন্ন সেখানে বুঝি প্রতারণাময় মর্ত্তের কুটীলতা, ক্লেশ, দুঃখ, স্বার্থপরতা, কামান্ধতা প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানেতে যেন ভালবাসা, ধর্ম্ম, স্নেহ ভিন্ন কিছুই নাই; সুধার স্বরে আমার মোহ বিদূরিত হইয়া গেল, অন্য রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি সুধার উভয় হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম, "সুধা তোমার নাকি বিবাহ হইবে?"

সুধা মৌন ভাবে রহিল।

"তোমার কি আমার জন্য মন কেমন করিবে না—সুধা?"

"করবে বইকি দেবেন দাদা।"

"তোমার বিবাহ হইলে, তুমি কোন্ দেশে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তুমি আমাদের দেখিতে পাইবে না—তখন তুমি তো আমাদের একবার স্মরণও করিবে?"

"কেন করিব না—ও সকল কথা কেন দেবেন দাদা?"

"কেন? আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না। তুমি বিবাহিতা হইয়া সুখে বাস কর ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি। তখন অভাগা দেবেন দাদাকে দিনান্তে—অন্ততঃ মাসান্তেও—একবার মনে করিও। এতদিন আমরা একত্রে সুখে বাস করিতেছিলাম, দুঃখ কাহাকে বলে

জানিতাম না—কিন্তু ঈশ্বর বাদ সাধিলেন। তোমাতে আমাতে মিলন, ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

আমার পিতা বড়মানুষ নন্—সুতরাং আমিও দুঃখী। আমি অধিক আর কি দিতে পারি, এই অঙ্গুরীয়টী আমি তোমাকে দিতেছি—তুমি স্মরণ চিহ্নরূপে এটী লও। আশা করি তোমার নিকটে ইহার সদ্ব্যবহার হইবে, আমি চিরকাল অবিবাহিত থাকিব।”

সুধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি সুধার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, “সুধা কাঁদিও না, কেহ দেখিতে পাইলে কি মনে করিবে বল দেখি? আমি চলিলাম, তোমারই ধ্যানে, তোমারই চিন্তায় এ জীবন যাপন করিব।”

তাহাকে আর কিছু না বলিয়া আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

(৭).

“তাহার পর যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। ঈশ্বরের লিখন ললাট পট হইতে কিছুতেই মুছিবার নহে। নরভাগ্য কখনও ঈশ্বরের বিপরীতাচরণ করিতে পারে না। সুতরাং আমার নিমিত্ত তাহা ব্যতিক্রম হইবে কেন?”

ভিখারী আবার কহিল, “কলিকাতার নরেন ঘোষ নামে কেহ আমার সুধাকে পর করিয়া লইয়া গেল।”

এই বলিয়া ভিখারী নিস্তব্ধ হইল।

তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যেন একটা মহা প্রলয়ের সূচনা হইল। বড় বেগে ঝড় বহিতে লাগিল—এমন ঝড় আমি বহুদিবস দেখি নাই, গল্পের শেষটুকু শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ভিখারীর গল্প শুনিয়া আমার আপনার উপর কেমন ধিক্কার জন্মিয়া গেল; কেন তাহা পরে বলিতেছি।

আমি ভিখারীকে সাগ্রহে বলিলাম,"তুমি ঘরের ভিতরে উঠিয়া এস,বড় ঝড় বহিতেছে। তোমার জীবনীর শেষটুকু না শুনিয়া তোমায় ছাড়িয়া দিব না।"

ভিখারী প্রথমে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে সে গৃহের ভিতরে উঠিয়া আসিল।

আসিয়া ভিখারী কহিল, "আমার জীবনী কেন যে আপনার এত ভাল লাগিতেছে তাহা জানি না, সুধার বিবাহ আমি দেখি নাই— লোক মুখে শুনিয়াছি। কারণ বিবাহের পূর্ব্বদিন এলাহাবাদ হইতে আমি চলিয়া আসি, সে স্থান আমার পক্ষে কেমন বিষদৃশ্য বোধ হইল।—আমি কিছুতেই তথায় তিষ্ঠিতে পারিলাম না। রজনীকালে পরিবারস্থ সকলের স্নেহ কাটাইয়া এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়াছি। সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। ঐই পাঁচ বৎসর আমি বহু স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই। তাহারপর এখন কলিকাতায় আছি, শীঘ্রই বোধ হয় কলিকাতা ত্যাগ করিব। ইহাই আমার জীবনের অতীত কাহিনী।"

ভিখারী চুপ করিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"তুমি তো বলিতেছ দু'একটা পাশ দিয়াছ। তাহা সত্ত্বেও কেন ভিক্ষা-বৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ?"

ভিখারী কহিল, "সংসারের উপর আমার কেমন ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। কেন তাহা আমি নিজেই জানি না। মনে হয়, এ সংসার কেবল দর্প, দ্বেষ, কষ্ট স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। আমার মনকে গৃহাভিমুখী করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহাতে কৃতকার্য্য হই নাই। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? বলুন—তাহা হইলে আমি এখান হইতে চলিয়া যাই।"

আমি তাহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া চিন্তিত মনে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। আমার স্ত্রী তখন সূচী-কার্য্য করিতেছিল।

আমি তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলাম—"সুধা! তোমার পিতার বাটীর পার্শ্বে কি দেবেন্দ্র বলিয়া একটী যুবক থাকিত? সে কি তোমাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল?"

সুধা চমকিত হইয়া বলিল, "হাঁ—ছিলেন। আমি তাঁহাকে দাদা বলিতাম। তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? কিরূপে একথা জানিলে?"

"তোমার সেই দেবেন দাদা আজ আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।"

"দেবেন দাদা—সে কি? কোথায় তিনি?"

(১০)

তাহার পর ভিখারীকে দেখিয়া সুধা বড় কাতর হইয়া পড়িল।

ভিখারী প্রথমে সুধাকে চিনিতে পারিল না—পরে চিনিতে পারিয়া বিস্মিত-নেত্রে সুধার দিকে তাকাইয়া বলিল, "সুধা—তুমি এখানে?"

তৎপরেই ভিখারী কক্ষতলে পতিত হইল। আমি ব্যস্ত হইয়া তাহার ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহের দিকে দৌড়িয়া গেলাম—কি সর্ব্বনাশ! গাত্রে হস্ত দিয়া দেখিলাম ভিখারীর হতাশ জীবন দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানিত দেশাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

সুধা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

বাহিরে তখন মহাবেগে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত হইতেছিল।

* * * *

তাহার পর তের বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—জীবনে বহুঘাত প্রতিঘাতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সেই ভিখারীর বিষাদময় জীবন-কাহিনী এখনও আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

ফৈজী বাই।

(ঐতিহাসিককাহিনী)

মোগল রাজত্বের রাজধানী ধন-ধান্য-সমৃদ্ধি-শালিনী দিল্লী নগরীর খাইজী-মহাল নামক স্থানের এক ত্রিতল গৃহের একটী সুন্দর প্রকোষ্ঠে একদিন সন্ধ্যার সময় দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, "বল কি মোবারক! এক লক্ষ টাকা বায়না? এ দাঁওত কিছুতেই ছাড়া হ'তে পারে না, তুমি কি বল?" প্রশ্নকারিণী যুবতী নিসর্গসুন্দরী। যাহার মদনোন্মাদ হলাহল-কুম্ভ তুল্য অপূর্ব্বদৈহিক-সৌন্দর্য্য-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া মুসলমান-ইতিহাস সগর্ব্বে বহন করিয়া থাকে, প্রশ্নকারিণী সেই ফৈজী বাই *

* অনেকে বলেন যে ফৈজী সেনাপতি মোহন লালের ভগ্নী; কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বীখাঁ বাহাদুর ও বিভারিজ সাহেবের মতে লুৎফউন্নেসাই মোহনলালের ভগ্নী, বিশেষতঃ সায়র মুতাক্ষরীণ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদক মুস্তাফা তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের প্রথম খণ্ডের ৫১৪ পৃষ্ঠায় বলেন :—

This lady (Lut-Fa-un-nisa) is now (1789) living at Murshidabad * * * She must not be confounded with Faizy or Faizan, another favourite of Seraj-uo-doulah's &c.

মোহনলালকে রিয়াজুস সালাতীন নামক গ্রন্থে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; ফৈজী যদি তাঁহার ভগিনী হইত, তবে সরম-সঙ্কুচিতা বাঙ্গালী রমণীর পক্ষে নর্ত্তকীর ব্যবসায় ও তদুপলক্ষে দিল্লী গমন করা যেন কেমন অসম্ভব বোধ হয়। মোহনলাল সম্বন্ধে কোন কথাই ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে মুতাক্ষরীণ ৭১৭ পৃঃ বলেন "Mohun Lal had made a present of his sister to Seraj-uo-doula."

ফৈজী শৈশবে দরিদ্র-কন্যা ছিল কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে তাহার অনুপম রূপ-লাবণ্য-সৌরভ তাহাদের সেই তরুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন শতজীর্ণ কুটীরাভ্যন্তর হইতে দিল্লীর মসনদে গিয়া পৌঁছিল; অনেক আমীর ওমরাহ তাহার সেই পেলবকোমল, মৃদুগম্ভীর ললিত চঞ্চল রূপ মাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। তাই দরিদ্রা ফয়জান আজ ফৈজী নামে দিল্লীর প্রধানা নর্ত্তকী।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়া বাইজী ফৈজীর অনৈসর্গিক-রূপ কল্লোল-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, সেই দ্বিতীয়া নুরজাহানকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিত্য-ক্ষুধিত সতত অতৃপ্ত আত্মা অস্থির হইয়া পড়িল, তিনি বাইজীকে মুর্শিদাবাদে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। একলক্ষ মুদ্রা নজর স্বরূপ লইয়া সিরাজের প্রিয় ভৃত্য মোবারক দিল্লী যাত্রা করিলেন; † এদিকে নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসিয়া পিপাসা-পীড়িত চাতকের মত উর্দ্ধমুখে চাহিয়া তাহার আশাপথ প্রতিক্ষা করিতে লাগিল।

সুচতুর মোবারক গিয়া ক্রমে ক্রমে ফৈজীর সহিত কথাবার্ত্তায়

† ইহাতেই বোধ হয় মোহনলাল ফৈজীর ভ্রাতা নহেন, কারণ ঐতিহাসিকগণ বলেন, "মোহনলাল তাহার ভগ্নীকে সিরাজকে উপহার দিয়াছিল; কিন্তু সিরাজ বহু অনুনয় বিনয়ে ফৈজীকে দিল্লী হইতে আনায়ন করেন। মুস্তাফা ৬১৪ পৃঃ ফুট নোটে বলেন :—

"This Last (Faizy) had been a Kuechri at Delhi that is a dance-girl from whence her attendance had been supplicated at the Court of Murshidabad, the request being accompanied by no less than a draught of one lac of Rupees.

[ঐতিহাসিক বাবু নিখিল নাথ রায়ের মতে ফৈজী মোহনলালের ভগ্নী ছিলেন বটে, কিন্তু মোহনলাল নবাবের প্রিয়পাত্র হইবার লোভে নিজ ভগ্নীকে নবাবকে উপহার দেন নাই]।

মুর্শিদাবাদ আগমনের কথা বলিল; বংশীমুদ্রাহরিণীর ন্যায় অর্থ-লোভ-লুব্ধা বাইজী সহজেই মুর্শিদাবাদ আসিতে স্বীকৃতা হইল। ফৈজীর আগমন-সংবাদ পাইয়া নবাব হিরাঝিল নামক প্রাসাদে নাচের আয়োজন করিলেন। এ উৎসবে তাঁহার ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ও কেবলমাত্র দুই এক জন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ নিমন্ত্রিত হইলেন; বোধ হয় নবাবের ইচ্ছা ছিল যে সাধারণ দৃষ্টির অন্তরাল হইতে সেই অলৌকিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সম্ভার অপসারিত করিয়া সেই মধুর মদির রূপরসে আপনাকে ভাসাইয়া দেন; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ, ক্ষীণদুর্ব্বল মনুষ্য সেই অনন্ত ইচ্ছা স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কিরূপে সক্ষম হইবে?

হিরাঝিল প্রাসাদের পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া স্ফটিক স্বচ্ছ ঈষৎ নীলাভ বারিরাশি, যখন ধীর সমীর লহরে নাচিয়া বেড়াইত, তখন সেই সুরম্য স্বর্ণখচিত প্রাসাদের নয়নরমা প্রতিচ্ছবি সেই হীরকস্বচ্ছজলকোলে নাচিয়া উঠিত—দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত জ্যোৎস্না—বিধৌত সৌন্দর্য্য সারভূত প্রাসাদ রত্ন যেন হাসিতে হাসিতে মুকুরে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। শুনা যায় সতত আলিবর্দ্দির সহিত বাস করিলে আপন বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হইবে না ভাবিয়া সুচতুর সিরাজ এই মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদের কক্ষ সমূহ সর্ব্বদাই প্রোদ্ভিন্ন যৌবনা সুচারু দর্শনা নর্ত্তকীবৃন্দের শুভ্র চরণস্থিত নূপুর নিক্কনে ক্বনিত ও শুভ্র-বাহুলতা-বেষ্টিত হৈম বলয় শিঞ্জনে সিঞ্জিত হইয়া থাকিত; কক্ষাভ্যন্তস্থ বায়ু অহরহ সুধাকণ্ঠী গায়িকা কুলের কণ্ঠ-নিঃসৃত অমিয়-কাকলীতে গুঞ্জিত হইয়া থাকিত।

জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে সরসী-বক্ষ-বিহারিণী-তরুণীগণের কণ্ঠ-ধ্বনি যখন দিগন্তপ্লাবিত করিয়া সুদূর অনন্তের পথে ছড়াইয়া পড়িত, তখন বোধ হয় সেই সুরব সমাকৃষ্ট হইয়া ভাগীরথী তরঙ্গ লহরী বেলাভূমিতে উলটি পালটি আছাড়াইয়া পড়িত।

এই সুন্দর-প্রাসাদ কক্ষ আজ বাইজী ফয়জানের অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাহার সুন্দর-রূপ-মাধুরী শতধারে উছলাইয়া দিতেছিল। ভাগীরথীর শীতল-শীকর পৃক্ত মন্দমলয়ানিল অদূরবর্ত্তী আম্রকুঞ্জ হইতে ফুটন্ত-মুকুল-গন্ধ বহন করিয়া আসিতেছিল—প্রাসাদ মধ্যস্থ স্ফটিক নির্ম্মিত দীপাধারস্থিত দীপাবলীর ঈষং-নিষ্প্রভ নির্ব্বাত-নিষ্কম্প আলোকে কক্ষ্যভ্যন্তর যেন পূর্ণিমা-চন্দ্র কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িতেছিল। স্তম্ভস্থিত শ্বেত-শুভ্রলগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তির গলদেশ-লগ্ন-মাল্য সমূহ হইতে অর্দ্ধ বিকশিত গোলাপ বেলা চম্পক চামেলীর পাপড়ী ঝরিয়া পড়িতেছিল—গোলাপের মধুর গন্ধ যেন কি এক অজানিত আবেশ ভরে ঘোরালো হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় তন্বী কৃশাঙ্গী ফয়জান চতুর্দ্দিক নূপুর-নিক্কণে মুখরিত করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল, সেই কৃশাঙ্গীর ক্ষীণ তনুলতায় যে অপার্থিব মাধুর্য্য নিহিত ছিল, নৃত্যকালীন তাহা যেন তাহার চক্ষে বক্ষে কক্ষে ও প্রতি অবয়বে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—রূপলাবণ্য রাশি যেন তাহার প্রতি দ্রুত পদক্ষেপে উঠিয়া পড়িতে লাগিল। সিরাজ তাহার অপরূপ রূপ, অনুপম সৌন্দর্য্য ও কৌশল দর্শনে বংশীমুগ্ধ অজগরের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে ফৈজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন ফয়জানের সেই প্রভাতারুণ-কিরণ-কণ জাগরিত অর্দ্ধবিকশিত শতদলের ন্যায় মদির বিহ্বল নয়নদ্বয় বড় সুন্দর—তাহার চূর্ণ কুন্তলরাশি সমীর হিল্লোলে স্বেদবিন্দু বিজড়িত হইয়া যাইতেছে। নৃত্য শেষ হইলে চারিদিক হইতে সুখ্যাতি ধ্বনি উঠিল; ফৈজী একটু বিশ্রামার্থ দাসীর সহিত অন্য প্রকোষ্ঠে গমনোদ্যতা হইল; যাইবার সময় রূপমুগ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবাবের উপর একবার আবেশাবেগ বিমিশ্রিত তরল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গেল। নবাব মরণাহতবৎ পড়িয়া রহিলেন, নারীরূপ-বিষ যে নরকে কতদূর জর্জ্জরিত করিতে পারে তাহা বলা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

চিরদিন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত সিরাজ তাঁহার মনকে সংযত

করিলেন না, বরং সেই দেবী দুর্লভ রূপসাগরে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন—কূল পাইবেন কিনা ভাবিয়াও দেখিলেন না। ভাবিলেন যে কুসুম দেখিতে এমন মনোরম, জানি না তাহার ঘ্রাণ কত মধুর—রূপন্মোত্ত সিরাজ ভাবিল "এরূপ * আমায় ভোগ করিতেই হইবে, তাতে যদি সর্ব্বস্ব যায় তাও ভাল!"

সিরাজের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। বাইজী ফৈজী সিরাজের প্রণয়িনী-রূপে হিরাঝিল প্রাসাদে বাস করিতে স্বীকৃতা হইল। সিরাজ এই সুন্দরী বাইজীকে সাধারণ বেশ্যার ন্যায় তাঁহার বিলাসাগারে স্থান দেন নাই, তাহাকে ফৈজী বেগম আখ্যায় সসম্মানে স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিলেন। সিরাজেরও দৈহিক সৌন্দর্য্যের খুব প্রশংসা ছিল, শুনা যায় অমন অনিন্দ্য সুন্দর কমনীয় কান্তি লইয়া বাঙ্গালার কোন নবাবই জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই সৌন্দর্য্য ললামভূত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া সামান্য একটা বারাঙ্গনা চরণতলে আত্মদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু ফৈজীর তাহাতে মন উঠিল না—যে বনচারিণী বিহঙ্গিনী সুনীল আকাশবক্ষে স্বাধীনভাবে উড়িয়া বৃক্ষে বৃক্ষে সুমধুর ফলের স্বাদগ্রহণ করিত, সে কি কখনও স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া নর-কর-দত্ত হৈমপাত্র ন্যস্ত দ্রব্যে তৃপ্তি উপভোগ করিতে পারে? যে মত্ত-মাতঙ্গী করীযুথ সহকারে নির্জ্জন-নিস্তব্ধ গহন কাননবক্ষে অসংযত

* ফৈজীর রূপলাবণ্যের কথা মুতাক্ষরীণে অনেক পাওয়া যায়; এবং তাঁহার কৃশাঙ্গীত্বের অত্যন্ত সুখ্যাতি শুনা যায়। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক মুস্তফা ইহাঁর অনেকগুলি চিত্র বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন:—"When she ate *Paan* পান) you might have seen thorough her skin the colored liquer ran down through her throat, and she was so delicate as to weigh twenty-two seers. (Vol. I. p. p. 717 p. 614—15).

পাদক্ষেপে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সে কি কখন সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে পারে? যে ক্ষীণকায়া সুধীর প্রবহমানা তটিনী কুলু কুলু নাদে উভয় কুল প্রতিধ্বনিত করিয়া মৃদু মন্থর গমনে সাগর-সঙ্গমে মিশাইতে যাইত, সে কি কখনও তুচ্ছ বালুকা-বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে পারে? সে যেমন গুমরি গুমরি ফুলিয়া উঠিয়া সেই ক্ষীণ-বন্ধন টুটিয়া প্রবল বেগে বহিয়া যায়, ফৈজীর সদা স্বাধীন হৃদয় তদ্রূপ আজ একজনের উপভোগার্থে—অন্তঃপুরের বদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ রহিল না, অন্য দিকে ধাবিত হইল।

সিরাজের ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে ফৈজী প্রথম দিন নৃত্য সভায় দেখিয়াছিল; হতভাগিনী তাহাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত অধীরা হইয়া পড়িল। সৈয়দ মহম্মহম্মদ খাঁর অত্যন্ত বলিষ্ঠ গঠন। ফৈজী ও দেখিতে ইউরোপীয় নারীদিগের ন্যায় সুন্দরাকৃতি ছিল। ফৈজী একজন বিশ্বাসী বাঁদিকে দিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে স্বীয় প্রকোষ্ঠে আনয়ন পূর্ব্বক স্বকীয় বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। হতভাগ্য রূপমুগ্ধ সিরাজ এক বিশ্বাসঘাতিনীর কুহকে এইরূপে প্রবঞ্চিত হইতে লাগিল; অতুলনীয়রূপ, প্রফুল্ল যৌবন, অসামান্য ঐশ্বর্য্য, অতৃপ্ত কামনা, সমস্তই সিরাজ ফৈজীর চরণতলে উৎসর্গ করিয়াছিল, প্রমোদ উদ্যানে, সরসী-বিহারে, সুখ শয্যায়, নৃত্যোৎসবে সকল সময়েই নবাব ফৈজীকে না পাইলে তৃপ্ত হইতেন না, শয়নে স্বপনে জাগরণে মরণে তিনি ফৈজীর ছিলেন; ফৈজীর সুখের নিমিত্ত নবাব অকাতরে স্বীয় সিংহাসন, এমন কি হৃদয়ের নিগূঢ় নিস্তব্ধ প্রদেশোৎপন্ন রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। বোধ হয় ফৈজী চলিয়া গেলে নবাব তাহার সেই কোমল শুভ্র অলক্তক-রক্তিম-মগ্ন চরণতলে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত পাতিয়া দিতে পারিতেন—সেই নবাব তাঁহার সেই বুকভরা ভালবাসার পরিবর্ত্তে জলন্ত জ্বালাময় এক বিষ-বজ্রাঘাতের বিষাদ ব্যথা ভিন্ন আর কিছুই পান নাই।



আজ এখনও এ উদ্যানে কেন ?

[কৈজাবাই—৭ পৃষ্ঠা ।]

(৪)

ফাল্গুনের পূর্ণিমার যামিনীতে আম্রমুকুলের মদ-মধুর সৌরভ বহন করিয়া বসন্তসমীর ললিতলহর তুলিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে,—হিরা-ঝিলের তটস্থিত সান্ধ্যান্ধকার আশ্রয়দাতা এক পুরাতন লিচুগাছের ঝোপের ভিতর হইতে একটা অতৃপ্ত অশ্রান্ত পাপিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার করুণস্বর লহরীতে নৈশ গগন প্লাবিত করিতেছে—ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন সান্ধ্য আকাশ বক্ষে সেই স্বর আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিয়া যেন কোন চিরেপ্সিত চিরবাহিতের নিমিত্ত অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিতেছে—সেই শান্ত মৃদু অনিল কম্পিত জলরাশির উপর একটা জ্যোৎস্না রেখা যেন মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। অদূরবর্ত্তী ভাগীরথীর কুলু কুলু রব, পথবাহী নৈশ পথিকের সকরুণ গীতি-ধ্বনি, পথহারা বাঁশরীর আকুল রব, মাঝিগণের সারিগান, নিশাচর বিহঙ্গের মধুর কাকলী, তরু পল্লব মর্ম্মর ধ্বনী সমস্ত একত্রে মিলিয়া যাইতেছে ; এমন সময়ে সেই আম্রমুকুলের উদ্যানে জনৈক যুবতী একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে। যুবতী ফয়জান, ক্ষণপরে তথায় সিরাজ আসিয়া সস্নেহে ফৈজীকে কহিল, "আজ এখনও এ উদ্যানে কেন? এস প্রাসাদে যাই।" সিরাজকে দেখিয়া ফৈজী বিনা আপত্তিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। অতঃপর প্রাসাদে গিয়া সিরাজ ফৈজীকে লইয়া নানারূপ প্রেমালাপের পর অন্যত্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু ফৈজীর পক্ষে আজ সিরাজের সে প্রেমসম্ভাষণ তত ভাল লাগিল না, সে যেন অন্য কোন বাঞ্ছিতের আশা-পথ চাহিয়া বাতায়ন-পথে আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যেন আজিকার পূর্ণিমা নিশিতে কোন এক সমুদ্র হইতে একটা কিসের অজানা তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়ের বেলাভূমিতে আছাড়িয়া ফৈজীর সেই শুভ্র-ফুল্ল মুখে কি এক অব্যক্ত অপ্রসন্নতার কলঙ্ক রেখা পাত করিয়া গিয়াছে। সেই বিরহ ব্যথিতা ফৈজী বোধ হয় ভাবিতেছিল, এই মধুর—সৌন্দর্য্যশালিনী পূর্ণিমা প্রকৃতিও বুঝি তাহারই মত কাহার আশায়

যৌবনের স্বপ্নরহস্য অজ্ঞাত পুলকে, অব্যক্তবিষাদে অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ পর্য্যন্ত, এমন কি বোধ হয় তাহাও অতিক্রম করিয়া নীরবে নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছে ; যেন কোন অজ্ঞাত দেবতার চরণোদ্দেশে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিবে বলিয়া আকুল হইয়া অনন্তের পানে চাহিয়া আছে।

ঠিক এই সময়ে বাতায়ন পথে এক রমণীয় পুরুষ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। একটা আস্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফৈজী বলিল, "তাই ভাল, আমি মনে করি তুমি ভুলে গেলে বুঝি"। পুরুষ মূর্ত্তি স্মি[illegible]সা বলিল, "যদি তোমাকেই ভুলিব, তবে জান কবুল করিয়া কি নবাবের রঙমহলে প্রবেশ করি ? তবে কি জান একটু দেখিয়া শুনিয়া আসিতে হয় বৈকি— কি জানি দেওয়ালেরও কান আছে, আমার ত এক এক সময় বোধ হয় যে, নবাব এ কথা টের পাইয়াছে।"

ফৈজী তাহার সদা চঞ্চল আয়ত নয়নে একবার বিদ্যুৎ ঝলসিয়া বলিল, "তুমি পাগল হ'লে মহম্মদ! নবাবের সাধ্য কি যে এ কথা টের পায়।"

আগন্তক সৈয়দ মহম্মদ খাঁ। একটু সরম সঙ্কুচিত ভাবে সৈয়দ মহম্মদ বলিলেন, "কি জানি, আজ এখন এদিকে আসিবার সময়ে খোজা মোবারকের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, সে একথা নবাবকে জানাতে পারে।"

বলিতে বলিতে গৃহ ভিত্তি বিলম্বিত বিপুল মুকুর বক্ষে চাহিয়া দেখিলেন সেই নির্ম্মল স্বচ্ছ সরসী তুল্য দর্পণ বক্ষে কাহার এক সুদীর্ঘ সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—চমকিয়া মহম্মদ দেখিল সে মূর্ত্তি সিরাজের—আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই মহম্মদ বাতায়ন পথে লম্ফ প্রদান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্রম করিয়া একটা আওয়াজ হইল আর বন্দুক বিনির্গত এক শুভ্ররেখা প্রকটিত হইল—কিন্তু সিরাজের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া সৈয়দ মহম্মদ নিরাপদে পলায়ন করিল। ফৈজী বাই বিস্ময়ান্বিত নেত্রে পশ্চাতে ফিরিয়া

দেখিল, বন্দুক হস্তে নবাব সিরাজদ্দৌলা। ক্ষোভে ক্রোধে ঘৃণায় নবাব কাঁপিতেছেন, রোষে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে—ফৈজীর হস্ত ধরিয়া নবাব সক্রোধে বলিলেন, "একি ফৈজী?" সমীরাভিঘাতা বেতস পত্রবৎ কম্পিতা ফৈজী বলিল, "কি?" ভয়ে ফৈজীর কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিল। সুপ্ত সিংহের মতন গর্জ্জিয়া নবাব বলিলেন, "পাপীয়সি! তোর এই ক্ষুদ্র দেহে এত পাপ——এত বিশ্বাসঘাতকতা——এত নারকীয় দানবী বৃত্তি সঞ্চিত আছে?' জীবন পরিবর্জ্জিতা নৈরাশ্য পীড়িতা ফৈজী বলিল, "কেন আমি কি করিয়াছি?" গম্ভীর নিনাদে নবাব বলিলেন, "পাপীয়সি! তুই কি করিয়াছিস্? যে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব তোর মত কাম-লিপ্সু রমণীর চরণতলে আপন অতুল্যরূপ, অভাবনীয় পদমর্য্যাদা, অত্যাজ্য প্রেম দান করিয়াছে, তাহার সেই সুগভীর প্রেমের প্রতিদানে তুই তাহার প্রাণে গরল ঢালিয়া দিয়াছিস্। ইহা দিল্লীর বাইজী মহাল নয়, এটা নবাব সিরাজদ্দৌলার অন্দর মহল, এখানে ঐ পাপের দণ্ড কি জানিস?"

সিরাজের ক্রোধ দেখিয়া ফৈজী ভাবিল আর কেন, আমার সুখের আশা তো ফুরাইয়াছে, তবে ইহার অনুগ্রহ দত্ত জীবন ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ পূর্ব্বক গত সুখের এই নিদারুণ স্মৃতির অনলে দগ্ধ হওয়ার আবশ্যক কি? আমি তো আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়ায় বেষ্টিত রহিয়াছি, তবে আর কেন? ফৈজী বলিল, "নবাব! প্রাণের উপর কাহারও জোর চলে না, তুমি লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে আমার রূপ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলে, তাহা তো তোমায় দিয়াছি, কিন্তু আমার প্রাণ তোমায় কেমন করিয়া দিব।"

"দূর পিশাচি!" তুই অতি হেয় সামান্যা বেশ্যা।" দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া সংক্ষুব্ধ সিরাজ এই কয়েকটী কথা বলিলেন।

আসন্ন মৃত্যু সন্নিকটে দেখিয়া ফৈজী বলিল, "হাঁ জাঁহাপনা! আমি

তো বেশ্যা, জানিয়া শুনিয়া আমায় সতী করিতে চাহেন কেন? বরং আপনার সতী মাতাকে একটু সাবধানে রাখিবেন।"

ঘৃণায় রোষে ক্ষোভে লজ্জায় উন্মত্তের ন্যায় সিরাজ সেথান হইতে চলিয়া গেলেন—আর পাপীয়সী ফয়জান তাহার সেই কুসুম-সুকুমার দেহলতিকা সুগন্ধি-প্রক্ষিত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় ন্যস্ত করিয়া শয়ন করিল।

সিরাজের মাতা আয়মানা বেগম ও মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগম উভয়েই হোসেন কুলী খাঁ নামক একজন কর্ম্মচারীর সহিত ব্যভিচারে রত ছিলেন, ইহা নবাবের রঙ্গ মহলে প্রায় কাহারও অবিদিত ছিল না। সেই কলঙ্ক-কাহিনী উত্থাপন করিয়া সিরাজকে শ্লেষবাণে বিদ্ধ করায় সিরাজ ফৈজীর উপরে অন্তরে অন্তরে ক্রুদ্ধ হইলেন—তাহাকে দুগ্ধ-রম্ভা পরিপুষ্টা কৃতঘ্ন ফণিণীর তুল্য ভয়ঙ্করী বোধ করিতে লাগিলেন, নতুবা নবাব তাহার রূপে যেপ্রকার মুগ্ধ হইয়াছিলেন হয়ত সে রূপপ্রভায় মোহিত হইয়া ফৈজীর সে ব্যভিচার অপরাধ ক্ষমা করিলেও করিতে পারিতেন। নিদারুণ বিশ্বাস-ঘাতকতার তীব্র হলাহলে, ব্যর্থ প্রণয়ের বিষবজ্রাঘাতে, নবাবের মন যেন কি এক তীব্র-তিক্ত রসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, ক্রুদ্ধ সিরাজ ডাকিল, মোবারক!" আজ্ঞামাত্রেই মোবারক আসিলে সিরাজ বলিলেন, "পাপীয়সী ফৈজীর কক্ষ-দ্বার গ্রথিত করিয়া তাহার পাপ-সৌন্দর্য্য-স্মৃতি ধরাবক্ষ হইতে অবিকৃত ভাবে লুপ্ত করা হউক।"

তৎক্ষণাৎ ফৈজীর প্রকোষ্ঠ দ্বার জন্মের মত রুদ্ধ হইয়া গেল—এক চির-অনন্ত বিপুল-বিরাট-মসীবক্ষ ভেদ করিয়া অভাগিনীর আর্ত্তরবে শূন্য বায়ুস্তরে মিলাইতে লাগিল।

যে মোবারক একদিন পরম সমাদরে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কুসুমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই আজ স্বহস্তে তাহা শতখণ্ডে বিভক্ত করিল। হতভাগিনী ফৈজী মারমিয়নের কনষ্টাণ্টের ন্যায় এক নির্জ্জন বায়ু-আলোক-বিহীন প্রদেশে তীব্র তিয়াসায় ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

* * * *

তিনমাস পরে সিরাজের ক্রোধাবেগ উপশমিত হইলে অনুতপ্ত নবাব সেই প্রকোষ্ঠদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, ফৈজী তাহার অপার্থিব রূপরাশি পার্থিব কঙ্কালে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই আলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য রহিল গৃহ-মেজস্থিত একখানি ক্ষুদ্র কৃশ কঙ্কাল—সেই কঙ্কাল তাহার ক্ষীণায়তনের নিমিত্ত কাহারও মনে বীভৎসভাবের উদ্রেক করে নাই।

তাহার পর হইতে যখন নবাব সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তখনই তাঁহার মনে হইত যেন, পৃথিবীর অতল-স্পর্শ প্রদেশ হইতে একটী অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন ধ্বনি উঠিতেছে, যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর, লোক লোকান্তর পার হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া, অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে—ক্রমে যেন তাহা সূচ্যগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল, তাহার পর ধীরে ধীরে দিগন্তের কোলে মিশাইয়া গেল। সেই শব্দ শ্রবণে নবাবের শরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিত, তাঁহার বোধ হইত যেন একটা অতৃপ্ত অস্থির আত্মা বায়ুহীন গৃহান্ধকারের নৈশনিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া এক বিন্দু বারির নিমিত্ত সতৃষ্ণভাবে আকুল ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে—রাত্রির নির্ম্মল আকাশ যেন তাহার করুণ ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে—আর পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন জাগিয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া কান পাতিয়া সেই শব্দ শুনিতেছে।

দিনকয়েক নবাব অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুনা যায় সে ফৈজীর ব্যবহারে তিনি সমগ্র রমণী জাতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তৎপরে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া যখন জানিলেন যে, তাঁহার পত্নী লুৎফউন্নেসার প্রবল-প্রেম-প্রবাহ কেবল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রধাবিত হয় তখন, সেই পূত-প্রেম-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া নবাব শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সিরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার বড় সাধের হিরাঝিল প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে—আর লোকে অতুলনীয়া সুন্দরী ফৈজীর কাহিনী স্মরণ করিয়া সেই স্তূপকে "সৌন্দর্য্য-সমাধি" বা "লালকুঠী" বলিয়া থাকে। যে স্থান একদিন ফৈজীর চঞ্চল চরণের নুপুর নিক্কণে মুখরিত থাকিত, আজ বন্য শৃগাল সেই স্থানে মনের সুখে চীৎকার করিতেছে—সিরাজের প্রাসাদের কতকাংশ ভাগীরথী গর্ভস্থ হইয়াছে, কতক অংশে কৃষকগণ শস্য বপন করিতেছে—সমস্তই কালের করালকালিমায় আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে।

মালতী

[সামাজিক আখ্যায়িকা।]

(১)

সম-বয়সীদের মধ্যে—"সুন্দরী" বলিয়া মালতীর একটু সুখ্যাতি ছিল। আমরা কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের আভাষ দিতে যাইয়া আপনার ব্যর্থ প্রয়াসের পরিচয় দিতে চাহিনা, কেননা কাব্যে আমাদের আইন সঙ্গত অধিকার নাই। নহিলে, "তিল ফুল নাশা", "অধর বান্ধুলি", "খঞ্জন নয়ন" "মুখ শশধর", "মৃণালকর"—পৃথিবীর এত স্থাবর অবস্থার জিনিষ—ইহাদের একটাকেও কি জোর করিয়া টানিয়া আনিতাম না? বাস্তবিক মালতীর মুখ দেখিয়া আমাদের কখনও চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হয় নাই, এবং সেই বালিকার বিশালায়ত চক্ষু দুটী দেখিয়া নীল পদ্মের উপমাটাও স্মরণে আসে নাই। তবুও বলিতেছি—মালতী সুন্দরী। সেফালিকার লাবণ্য, মল্লিকার মাধুর্য্য, আর বনযূথিকার সরম—এই তিনটী ত্রিধারায় ত্রিবেণীর মত মালতীর চারু অঙ্গে যুগপথ মিশিয়াছিল। মালতী পথে বাহির হইলে, সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির পানে পরম শত্রুও ফিরিয়া চাহিত।

মালতী—শ্যাম শীতল-শান্তিময় পল্লীগ্রামের এক নিভৃত কোণে, এক চির দরিদ্র ব্রাহ্মণের আঁধার কুটিরে, নভোনীলিমা-মাঝে ভাস্বর শুক তারার মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ পিতামাতার স্বর্গলুব্ধ চিত্তকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে মালতী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সুতরাং বাপের সোহাগে, মায়ের আদরে, দারিদ্র্যের মাঝেও মালতীর শৈশবকাল সুখেই কাটিয়াছিল। অভাব কাহাকে বলে সে জানিত না, একটু স্নেহের শাসনও সে

সহিতে পারিত না। এইরূপে অতিরিক্ত আদরে মালতী, কিছু অসহিষ্ণু, কিছু অভিমানিনী এবং কিছু গর্ব্বিতা হইয়া পড়িয়াছিল। বালিকার সমস্ত শৈশব-অভিধান, কেমন একটু উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল।

শৈলনন্দিনী নির্ঝরিণীর ন্যায়, আপনার আবেগে আপনি চঞ্চল হইয়া মালতী যখন খেলা করিত, পিতামাতার সে ভাবটী বড় মধুর লাগিত। সর্ব্বদা চ'খে চ'খে থাকিয়া ,ধুলা খেলা খেলিতে খেলিতেই মালতী এগারোয় পা' দিল; বালিকার কুসুম পেলব ক্ষুদ্র বুক খানিতে বসন্তের সাড়া পড়িল। বায়াসন্ধিতে কন্যার অবয়বের প্রতি জননীর দৃষ্টিই প্রথমে পতিত হয়। ব্রাহ্মণী দেখিলেন—তাঁহার বড় সাধের মালতী ফুল 'ফোট ফোট' হইয়াছে। আর বিবাহ না দিলে চলে না। স্বামী স্ত্রীতে অনেক পরামর্শ হইল। মালতীর যোগ্য পাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্রাহ্মণের বড় অর্থাভাব,—সভ্যতার এই গর্ব্বদৃপ্ত অভ্যুদয়কালে, স্বর্ণপণে পুরের ছেলে কিনিবার সামর্থ্য ব্রাহ্মণের যে একেবারেই নাই! তবে কি স্বর্ণপদ্ম পঙ্কিল জলে ভাসিবে? স্নেহলতা বিষতরুর আততায়িতায় স্থাপিত হইবে? রত্নহার বন্য পশুর কণ্ঠভূষণ হইবে?

ভাবনা চিন্তায় আরো দুই বৎসর কাটিল। আর স্থির থাকা যায় না। তের বছরের মেয়ে—দরিদ্রের পক্ষে বিধাতার জ্বলন্ত অভিশাপ! ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িলেন। কিন্তু রূপের জয় সর্ব্বত্র। মালতীর রূপ ছিল, রুদ্রপুরের জমীদার প্রতাপচন্দ্র, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া, মালতীর সঙ্গে একমাত্র পুত্র উমেশের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তারপর, শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে বলিতে পারি না, বৈশাখের, এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে—উমেশ ও মালতীর দুই হাত এক হইয়া গেল, কিন্তু হৃদয় দুইটী এক হইল কি?

বিষয়কর্ম্মের শিক্ষানবিশী করিবে বলিয়া, উমেশ তালুকেই থাকিত। পুত্রের বিবাহের এক বৎসর পরে, তিন দিনের জ্বরে জমীদার প্রতাপবাবু হঠাৎ মারা যান, কাজেই পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে উমেশকে দেশে আসিতে হইল। মালতী এতদিন বাপের বাড়ী ছিল, এই সময় শ্বাশুড়ী তাহাকেও আনাইলেন।

বাটীতে অন্য অভিভাবক কেহই ছিল না, শোকাতুরা জননীকে ফেলিয়া—উমেশের আর তালুকে যাওয়া ঘটিল না।

সহস্র অভুক্ত আশা লইয়া, চঞ্চল হৃদয় মালতী যখন দ্বিতীয় বার পতিগৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহার শৈশবের কুঁড়ি কৈশোরের রবি-করে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মালতীর রূপ তখন ভাদ্রমাসের ভরানদীর মত—কানায় কানায় পূর্ণ! স্বামী রমণীর দেবতা—শ্বশুর-শ্বাশুড়ী মহাগুরু—তাঁহাদিগকে সেবা ভক্তি করিতে হয়,—জননীর যত্নে এ বিষয়ে মালতীর বেশ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সুতরাং পতিগৃহে পদার্পণ করিয়াই, এই পদার্পিত মাত্রযৌবনা পুত্রবধূটী, বিনয় নম্র ব্যবহারে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে অনায়াসেই বশ করিয়া লইল। দাস দাসী সকলেই—নববধূর অনুগত হইল।

মালতী ভাবিয়াছিল—উমেশকেই সে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার করিয়া লইবে। কিন্তু মানুষে গড়ে, বিধাতায় ভাঙে। উমেশ তাহার যুবতী পত্নীকে রমণীর অধিকার টুকু বুঝিতে দিল না। ধনীর সন্তান প্রায়ই বিলাসের দাস, পিতার তীব্র দৃষ্টিতে উমেশের সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। মালতী দেখিল,—তাহার স্বামী, প্রফুল্ল কুসুম বনে মধুকরের মত, সহস্র মুদ্রার মাঝে নিয়ত নিমগ্ন! সুন্দরীর বালকণ্ঠের প্রেমসম্ভাষণের চেয়ে মোহরের মোহন ঝঙ্কার উমেশের বেশী ভাল লাগিত, মুদ্রার মধুর স্পর্শে—অপ্সরার কুসুম কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া, নরলোকেই উমেশ অমরার সুখভোগ করিত!

মালতী—স্বামীর কাছে সোহাগ চাহিল, পাইল—ধন; প্রণয় চাহিল, পাইল—ভূষণ! হায়! স্বার্থপর পুরুষ! নারীর প্রেম কি হীরক হেমে পরিতৃপ্ত হয়?

বিশ্ব কাব্যের অপূর্ব্ব ভাষ্য—নারী-রহস্য উমেশ বুঝিয়াও বুঝিল না!

(৩)

শ্বশুর বাড়ী আসিয়া মালতীর নরকযন্ত্রণাময় জীবনের উপর দিয়া, একে একে তিনটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে, বিজন চিন্তায় কত অরুণ উষা সোণালী সন্ধ্যায় পরিণত হইয়াছে, কত বিনিদ্র বিভাবরী—বাতায়নে বসিয়া কাটিয়াছে, একটী মুহূর্ত্তের জন্যও—স্বামী সোহাগের অরুণরাগে, মালতীর হৃদয় রক্তোৎপলের মত ফুটিয়া উঠে নাই!

স্বামীর একটী চুম্বনের জন্য মালতীর তৃষিত অধর অধীর হইয়া উঠিত, স্বামীর ফুল্ল মুখের একটী মাত্র কথা শুনিবার জন্য—তাহার ব্যগ্রহৃদয় আবেগে উছলিয়া উঠিত, স্বামীর হর্ষ আকুল কোমল করের রোমাঞ্চ স্পর্শের জন্য তাহার সেই সুকুমার দেহখানি বর্ষাগমে কদম্বকেশরের মত কন্টকিত হইয়া উঠিত, স্বামীর একটু স্নেহ দৃষ্টির আশায়—সেই সরল প্রাণটী এক অব্যক্ত বিশাল ব্যাকুলতায় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত; কিন্তু সেই চিরতৃষিত নারীর প্রেম, সর্ব্বগ্রাসী অর্থচিন্তা প্রমত্ত পুরুষের কাছে বুঝি নিদারুণ অন্ধ ইচ্ছাময়ী দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা!! উমেশের বিশ্বাস—সে তাহার পত্নীর ভরণপোষণের জন্যই কেবল দায়ী, ইহজগতে ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি আর তাহার কোন কর্ত্তব্যই ছিল না। বিধাতা, উত্তুঙ্গ গিরির মত—উভয়ের মাঝখানে কি এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যাহার জন্য দুইটী জীবন জন্মের মত বিষাক্ত হইয়া উঠিল! মালতীর সেই উদ্বেল উচ্ছাসময় হৃদয়টুকু, পতির মূক অবহেলায় একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল! মালতী জানিতে পারিল না—তাহার অপরাধ কি? কিসে সে স্বামীর অনুপযুক্ত? তাহার কি নাই? বিদ্যুদ্বিকাশী

মনোহর রূপ, ফুটন্ত যৌবন, অফুরন্ত ভালবাসা, সরল প্রাণ, সর্ব্বোপরি অনণ্য সুলভ তন্ময় হৃদয়—মালতীর কি ছিল না? তবে কেন সে উমেশের হৃদয়ে স্থান পাইল না? সে যে তাহার কিশোর জীবন—দেবোৎসৃষ্ট নির্ম্মাল্যের মত স্বামীর জন্যই রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার সেই আরাধ্য দেবতা ভক্তের ভক্তি-চন্দন-সুরভি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি এমন করিয়া চরণে ঠেলিল কেন?

মালতীর নব-বিকশিত যৌবনের মধুময় মুহূর্ত্তগুলি ক্রমে বিষময় হইয়া উঠিল, আর সেই হলাহলের উত্তেজনায় মর্ম্মস্থলের মুকুলিত অনুরাগ—অকাল জলদোদয়ে সদ্যবিকশিত নলিনীর মত শুকাইয়া গেল।

(৪)

ঠিক এই সময়—যখন অতীত ও বর্ত্তমানে এক বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত, ব্যর্থ আশার বেদনার সঙ্গে মালতীর মনের অন্তরঙ্গ দ্বন্দ চলিতেছিল,—সেই সময় ভাগ্যদেবী কোথা হইতে এক নব আনন্দ, নব আশা মালতীর নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

মালতী এক কন্যা প্রসব করিল। সদ্যোজাতার সুধাসিক্ত মুখ খানি দেখিয়া, তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত—মালতীর সমস্ত মর্ম্মবেদনা অপসৃত হইয়া গেল। একটী ক্ষুদ্র শিশুর কি দুর্জ্জয় শক্তি! এ শিশু বুঝি—মালতীর ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল—ত্রিপাদভূমির ছলনায়—বামনদেবের মত একে একে কাড়িয়া লইল। তাপ-খিন্ন-যৌবনে, হৃদয়ের যে স্থানটা মালতীর সর্ব্বাপেক্ষা শূন্য ঠেকিত, কচি ঠোঁটের মিষ্ট হাসিতে সে স্থান সহসা পূর্ণ হইয়া গেল। চিরদুঃখিনীর নিস্তরঙ্গ বিষাদময় জীবন স্রোতে আবার বুঝি আশার হিল্লোল উঠিল। ঊষার হিরণ্ময় কিরণে নিশার নিবিড় কালিমা মুছিয়া দিল। যুবতীর মলিন মুখে—হারা হাসি ফিরিয়া আসিল,—সে হাসি শারদীয় শুভ্রমেঘে বিদ্যুৎ বিকাশের মত ক্ষণিক ও ক্ষীণ।

উমেশ অন্তঃপুর প্রবেশের পথেই ধাত্রী মুখে—কন্যার জন্ম সংবাদ শুনিল। ধাত্রী বড় আশা করিয়া উমেশের কাছে মিষ্টান্ন বিশেষের প্রার্থনা জানাইল। উমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—"মেয়ে হ'য়েছে—এটা সুখবর নাকি?" বক্তার কণ্ঠস্বরে—তখন কি নৈরাশ্য, কি উপেক্ষা, কি দুর্দ্দমনীয় ঘৃণা! সূতিকা গৃহ হইতে মালতী একথা শুনিতে পাইল। প্রাণের জ্বালায় অভাগিনী শিশুটীকে বুকে টানিয়া লইল, উচ্ছ্বসিত অভিমানে অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। যে শিশু দেবতার আশীর্ব্বাদের মত—হতভাগিনীর অভিশপ্ত জীবনে আশার আলোক ঢালিয়া দিয়াছে—তাহার এত অনাদর? নিজের প্রতি স্বামীর উপেক্ষা বরং সহ্য হয়, কিন্তু শিশুর প্রতি এই নিদারুণ অবহেলা—মালতী সহিতে পারিল না। "মেয়ে হ'য়েছে—এটা সুখবর নাকি", স্বামীর এই একটী মাত্র কথায়, শিথিলতন্ত্রী বীণার মত মালতী সুন্দরী শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

(৫)

নারী ও বারি একই পদার্থ। নারীও জীবন, বারিও জীবন। নারী বিনা জীব জগৎ, বারি বিনা জড় জগৎ—মরুভূমিতে পরিণত হয়। বারির নিজের কোনও আকার নাই, পাত্রের আকারেই তাহার আকার নির্দ্দিষ্ট হয়; নারী ও যেমন পাত্রস্থ হইবে—তাহার আকারও সেইরূপ গঠিত হইবে। আবার দেখ,—বারি আধার ব্যতীত থাকে না, নারীও পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। বারি যখন বৃষ্টি বিন্দু রূপে দেখা দেয়—তখন সে আধার শূন্য, এই জন্যই—সে ভূমিতে পতিত হয়। অরক্ষিত অবস্থায় নারীর অধোগতিও অনিবার্য্য। নারী ও বারি উভয়েই দৃঢ়তাশূন্য—অথচ কোমলা—তরঙ্গিত ও তরলা। এই জন্য নারী ও বারি বড় সাবধানে রাখিতে হয়, নহিলে—একটু সুযোগ পাইলে—উভয়েই নিম্নাভিমুখী হইয়া ছুটিয়া যাই। তোমার সাধ্য কি যে, তুমি সে গতির রোধ করিবে?

নারীর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে, নারীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে, নারী-চরিত্র গঠন করিতে—পারে কেবল তাহার স্বামী। স্বামীর স্নেহ-শীতল স্নিগ্ধ-বক্ষে নারীর সকল যাতনা, সকল কামনা, সকল পিপাসা নির্ব্বাণ লাভ করে। যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি উদাসীন—সংসারে তার সুখের আশা বৃথা!

কি মহা তৃষ্ণায় মালতীর বুকের ছাতি ফাটিতেছিল, একদিনের জন্যও উমেশ তাহা ভাবে নাই। লালসা বিধুরা বনিতাকে একটা মুখের কথাতেও সান্ত্বনা করে নাই। উমেশের কর্ম্মক্লান্ত কঠোর জীবনটা—আগাগোড়া এমনি নির্জ্জন! উমেশ আজীবন পত্নীকে উপেক্ষা করিয়াছে—এই টুকুই তার ভুল। মালতীরও ভুল—পুরুষের উপর কি অত আশা স্থাপন করিতে আছে? উমেশ ভাবিয়াছিল—পুরুষ বিষয়-কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, রমণী শুদ্ধান্তঃ-শোভিনী হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবে। ইহা ছাড়া স্ত্রী-পুরুষের স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য নাই। মালতী ভাবিয়াছিল—যে নারী পুরুষের ভালবাসা পাইল না, তার নারীজন্ম নিস্ফল। স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু প্রতিদানে—একটু প্রাণের সোহাগ চাই। হায়! সংসারে প্রবেশ করিয়া দু'জনেই ভুল বুঝিল, কেহ কাহাকেও ধরা দিল না।

নারীর মন বড় কোমল, বড় চঞ্চল, নারী—স্বামীর তিরস্কার তাড়না হাসিমুখে সহিতে পাবে, কিন্তু উপেক্ষা সহিতে পারে না। মালতী দেখিল—তাহার জীবন কেবল দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস। বহুদিন হইতে একটু সামান্য বিকার, মালতীর স্বামীভক্তির পশ্চাতে থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় করিতেছিল, স্বামীর উপেক্ষা অনাদরে সে বিকার ঘোরতর সান্নিপাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন, হতভাগিনীর সেই অগাধ প্রেম—বিরক্তিতে পরিণত হইল। যেখানে ভালবাসা ছিল, সেখানে ধীরে ধীরে ঘৃণা আসিয়া দেখা দিল। মালতী ভাবিল—যে তাহার সমস্ত

জীবনটা এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে—সে সেই স্বামীর উপর প্রতিহিংসা লইবে।

সাক্ষাৎ কোমলতা ও পবিত্রতার জীবন্তপ্রতিমা, ন্যায়ান্যায় বিচার লূতাতন্তুর মত ছিন্ন করিয়া, নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, বিস্ফারিত ফণা বিষধরীর দৃপ্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল।

(৬).

ঘরে যা'র কেবল যন্ত্রণা, তা'র কি ঘরে আকর্ষণ থাকে। মালতী ধর্ম্ম ভুলিল, মাতৃস্নেহ ভুলিল, কুলের গৌরব ভুলিল। শেষে এক অন্ধতামসী নিশীথে—সুপ্তি-শান্ত শিশুমুখে শেষ স্নেহচুম্বন দিয়া, ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিল।

সে নিশি কি ভয়ঙ্করী! মেঘ-মেদুর অম্বরে দীপ্ত দামিনী অট্ট হাসিতেছিল, ঘন ঘন বজ্র হাকিতেছিল, গাঢ় অন্ধকারে আপনার পাপ-প্রতিকৃতি লুকাইয়া, মালতী মুক্তি-ভ্রমে মৃত্যু পথ আশ্রয় করিল।

অদূরে—এক বহুশাখা বিস্তারি বটবৃক্ষতলে, একজন যুবা মালতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। পাপিয়সী পিশাচের কণ্ঠবিলম্বিনী হইয়া, যুগযুগান্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা একটী যামিনীর মধ্যেই পূর্ণ করিয়া লইল।

মালতীর অন্তরে অন্তরে যৌবনের বাসনা-বহ্নি এতদিন গুমিয়া গুমিয়া জ্বলিতেছিল, আগ্নেয় গিরির জ্বলন্ত ধাতুনিস্রাবের ন্যায় আজ তাহা সম্পূর্ণ উৎসারিত! কুলবালার এই পরিণাম? হা ভগবন্! আকাশে সে দিন অশনি ছিল না, জগতে কি মরণ ছিল না! তাহাহইলে তো—দেবপূজার পুষ্প—দানব চরণে লুণ্ঠিত হইত না!

বারি অনেক সময় বাঁধ ছাপাইয়া বাধা না মানিয়া, চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। সমাজশাসন, লজ্জাসরম, ভাঙিয়া চুরিয়া—নারী-ও সাধারণের উদ্রিক্ত কুতূহল দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে বিলাইয়া দেয়। বারি কূল ছাড়িলে—কত ঘর ভাঙে, কত শস্য শ্যামল ক্ষেত ডুবিয়া যায়, কত জীব-

জন্তু প্রাণে মরে ; নারী কুলত্যাগিনী হইলে, কত লোকের সর্ব্বনাশ করে। তাই তো নারী—"অঙ্কে স্থিতাপি পরিশঙ্কনীয়া।"

মালতী মনে মনে কালানল পোষণ করিতেছিল, আজ সে অনলে আপনি পুড়িল, সংসার ও পুড়াইল। বৃষ্টি প্লাবিতা ঝঞ্ঝা লুণ্ঠিতা ধরণীর প্রণয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—অভিসারিকা পত্নীর এই গুপ্ত পদক্ষেপ, উমেশ আর শুনিতে পাইল না।

(৭)

সংসারের কঙ্কর কণ্টকিত পথে, পতির পদতল অক্ষত রাখিবার জন্য যে মালতী একদিন প্রেম ক্ষুধাতুর ক্ষুদ্র বুকখানি অনায়াসে পাতিয়া দিতে পারিত, সেই মালতী আজ বাঞ্ছিত ধনকে ভুলিয়া গিয়াছে। আজ সে পিশাচী—প্রবৃত্তির দাসী। যে সতীত্ব নারীর ধর্ম্ম, নারীত্বের গর্ব্ব, যে সতীত্ব ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে অদেয় অমূল্য ধন, মালতী উন্মত্ত ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম উত্তেজনায়, সেই সোনার সতীত্ব, লালসার পঙ্কিল জলে নিক্ষেপ করিয়াছে। বাসনার বহ্নি-কুণ্ডে আত্মাকে আহুতি দিয়াছে।

মানুষ এত স্বার্থপর—অভাব পূরণের জন্য সে সব করিতে পারে। একটু অতৃপ্তিতেই সে আত্মহারা। মানুষ বুঝিতে চায় না—অতৃপ্তিতে কত সুখ! একদিন প্রেমময়ী শ্রীরাধা একথা বুঝিয়াছিলেন—"লাখ লাখ নয়ন, বিধি কাহে না দিল হামারে?" ভগবন্! কেন আমায় লক্ষ নয়ন দিলে না? সে মুখ খানি, তাহা হইলে যে ভাল করিয়া দেখিতাম! দুটি চ'খে দেখে তো প্রাণের সাধ মিটিল না। তাই "বহুত পিয়াসার চন্দ্রমাশালিনী সা মধু যামিনীতে"—যমুনা পুলিনে ব্রজ-সুন্দরীর জনম-সাধ—পূর্ণ হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম—জগতে অতৃপ্তির বিরাম নাই, অতৃপ্তিতেই মানুষের সুখ, অতৃপ্তিতেই প্রেমের ললিত-স্বপ্নময়ী স্বর্গীয় মাধুরী! অতৃপ্তির তৃপ্তিই তো মৃত্যু। ধনের আকাঙ্ক্ষা—সুখের আকাঙ্ক্ষা—প্রেমের আকাঙ্ক্ষা—রূপের আকাঙ্ক্ষা—

জগতে কয়জনের মিটিয়াছে ভাই? যদি বাসনা পূর্ণ হইত, অতৃপ্তির যদি তৃপ্তি হইত, তাহা হইলে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের এই যে এত কাণ্ড-কারখানা, এসব তো চিরদিনের জন্যই নির্ব্বাণ লাভ করিত। যাহার জন্য আমি উন্মাদ, তাহাকে বুকে রাখিয়া আমার আশা যদি মিটিত, তাহাহইলে আমার আর থাকিল কি? হায়! অভাগিনী মালতী বুঝিল না—নারী হৃদয়ের আজন্মের সেই অতৃপ্তি যদি মুহুর্ত্তেই মিলাইল, তবে আর তাহার সম্বল রহিল কি? দলিত হৃদয়ে অব্যক্ত বেদনা বহিয়া, মুহূর্ত্তের অন্ধতায় মালতী আজ যে রত্ন হারাইল, জীবনপাতেও আর তাহা ফিরিয়া পাইবে না! সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়া সে যে আপনারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে!

তিন মাস পরেই মালতীর ঘোর কাটিল, মোহ টুটিল। হতভাগিনী বুঝিতে পারিল—পাপপথের সুখ কত টুকু! দৈহিক লালসার পরিতর্পণে—অতৃপ্তির তৃপ্তি হয় না। মালতী দেখিল—যাহাকে জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কর্ত্তব্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল,—সে তাহাকে ধুলিমুষ্টির মত সহসা পরিত্যাগ করিল! লম্পটের ভালবাসা দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়। অনুতাপে মালতীর হৃদয় ফাটিয়া গেল। লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ছি ছি! এই পিশাচকে সে শিরীষ কোমল বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল? যাহার জন্য সে আজ কুলত্যাগিনী—কই সে তো আর সুন্দর নয়! সে যে মালতীর সর্ব্বস্বাপহারী প্রবঞ্চক, সে যে অদৃষ্টাকাশের মূর্ত্তিমান্ শনিগ্রহ! উচ্ছিষ্ট জীবন লইয়া মালতী তবে কোথায় দাড়াইবে? জগতে আর তো তা'র আশ্রয় নাই।

এতদিনে মালতীর মনে পড়িল—সে কি কুকাজই করিয়াছে।—মালতীর যে সমস্তই গিয়াছে! এখন তাহাকে কে চিনিবে? সেই মলয়ানিল-প্রফুল্ল-বসন্তমল্লিকাবৎ সৌন্দর্য্য, আজ পাপ কালিমা কলুষিত,

সেই আবেশপূর্ণ উজ্জল নয়নে, আর তো সে লাজ নম্র মধুর চাহনি নাই, লালসার লেলীহান শিখা তাহাতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে! পাপিনীর প্রত্যেক নিশ্বাসে এখন দাবাগ্নির উচ্ছাস, প্রতি কথায় বিষের ঝলক! মালতী আজ স্বামীর চ'খে, সমাজের চ'খে, ততোধিক ঈশ্বরের পদে অপরাধিনী ও উপেক্ষিতা হইয়া, আপনার জন্য আপনি নিরয়-দ্বার উন্মোচিত করিয়াছে। মালতীর প্রাণ কাঁদিল, দূরদৃষ্ট সুখস্বপ্নের মত— "সর্ব্বতীর্থ সার" স্বামীর চরণ মনে পড়িল! আরো মনে পড়িল—সে যে তাহার শিশু সন্তানকে নিরাশ্রয় রাখিয়া আসিয়াছে।

মালতী আবার গৃহে ফিরিল।

(৮)

এক রজনীর ঘনঘটাপূর্ণ প্রলঙ্করী নিশীথে—মালতী নৈশ অভিসারে যাত্রা করিয়াছিল; আর এক রজনীতে, লম্পটের বাহুপাশ হইতে সজোরে আপনাকে মুক্ত করিয়া—মালতী গৃহে যাত্রা করিল।

মালতী চলিতেছিল—দুই হাতে বুক চাপিয়া। পাছে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। বিরল পথিক পথে—কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। তাহার স্বামীগৃহ বড় বেশী দূরে ছিল না। একটা অনতি বৃহৎ শ্যামপত্র বহুল আম্রকানন পার হইয়া, মালতী সেই চিরপরিচিত গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। প্রকৃতির সেই গভীর সুষুপ্তির মধ্যে—দ্বিতলের এক কক্ষ হইতে মৃদু রোদন নিনাদ ধ্বনীত হইতেছিল। শুনিয়া মালতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। কি এক অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কা, তরঙ্গসঙ্কুল সাগরোর্ম্মিতের ন্যায় অভাগিনীর পঞ্জরপটে আঘাত করিতেছিল। শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত পদে মালতী দ্বারে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই মালতীর সেই শয়ন গৃহ, যে গৃহে একদিন তাহার জীবনের কত সুখস্বপ্ন রচিত হইয়াছিল, এই তো সেই গৃহ! গৃহের দ্বার মুক্ত ছিল, হতভাগিনী চোরের মত ভয়ে ভয়ে আপনার গৃহে প্রবেশ করিল।

কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ক্ষীণ দীপালোকে মালতী দেখিল—মলিন শয্যাপরি তাহার শ্বাশুড়ী বসিয়া আছেন, তাঁহার ক্রোড়ে মরণাহত ক্ষুদ্র শিশু। মাতৃস্নেহের নিবিড় সুখতপ্ত পক্ষপুটচ্যুত শিশু—নির্ব্বাণকালীন দীপশিখার মত—অধরে মলিন হাস্যরেখা মাখিয়া শেষ নিশ্বাসের অপেক্ষা করিতেছিল। মালতী চিনিল—এশিশু তাহারি গর্ভজাত সন্তান। হায়! হায়! এ কি শোচনীয় দৃশ্য! এই দৃশ্য দেখিবে বলিয়াই কি মালতী আজ ছুটিয়া আসিয়াছে? মালতীর বুক ফাটিয়া গেল। মনে হইল—তখনি সেই ব্যাধিজীর্ণ ম্লান মুকুলটীকে বুকে চাপিয়া, সেই মরণ সুপ্ত মুখখানিতে একটী স্নেহচুম্বন আঁকিয়া দেয়। তখনি শ্বাশুড়ীর দৃষ্টি মালতীর উপর পড়িল। কলঙ্কিনী পুত্রবধূকে তিনি চিনিলেন। মালতী শ্বাশুড়ীর পদতলে বসিয়া পড়িল। ঘৃণায় দুঃখে মুখ ফিরাইয়া কঠোর কর্কশস্বরে শ্বাশুড়ী বলিলেন—"আবার কেন এসেছ তুমি? সন্তানঘাতিনী—রাক্ষসি! স্তনের দুধ না পেয়ে সোনার বাছার আজ কি দশা হ'য়েছে—তাই কি দেখ্‌তে এসেছ?" অশ্রুর উচ্ছাসে রুদ্ধকণ্ঠে আর কথা সরিল না। ঠিক সেই সময়ে মুক্তদ্বারপথে একটা দমকা বাতাস প্রবেশ করিল। ক্ষীণরশ্মি দীপ শিখা নিভিয়া গেল। পুরনারীগণের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে, পিতামহীর পবিত্র ক্রোড়ে, একটী স্বর্গীয় আত্মা ইহলোকে চিরশান্তি লাভ করিল।

প্রহার ক্লিষ্টা তাড়িতা কুক্কুরীর মত মালতী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহার চক্ষে জল ছিল না। আপনাকে আপনি ধিক্কার দিয়া মালতী বলিয়া উঠিল—"সন্তানঘাতিনী রাক্ষসী! নিজের কীর্ত্তি নিজের চ'খে দেখ্‌লে?"

উন্মাদিনী হইবার পূর্ব্বে—মালতীর মুখে ইহাই শেষ প্রকৃতিস্থ কথা।

মাধবীলতা

(১)

ললিত মোহন মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাতে কলিকাতা গেজেটে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ললিত মোহনের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের পর, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক ছুটাছুটি করিয়া ললিত মোহন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, আজ ললিত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বিশ্ববিদ্যালয় রূপ অকুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যে কি পরিশ্রম তাহা বঙ্গের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ বিলক্ষণ অবগত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী পরিক্ষায় যেন দ[redacted] পরমায়ু কমিয়া যায়, জীবনের উত্তেজনাশক্তি দিনে দিনে হ্রাস হয়, তাহার পর কোন না কোন রোগাক্রান্ত হইয়া যুবকগণ শীর্ণকায়ে শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে সংসার অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ললিত মোহনের আর আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নাই, বাসায় আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া নিজের পুস্তকরাশি বাক্সবন্দী করিতেছে, আর মনে মনে বলিতেছে, "আঃ বাঁচলেম, এখনত পড়া সাঙ্গ হ'ল, তার পর অদৃষ্টে যা আছে হবে। বি এল্ পড়তে হবে বটে, কিন্তু তাহা আজ না হয় দু'বৎসর পরেও হবে। এখন দিন কয়েক একটু বিশ্রাম করে বাঁচি। প্রাণটা যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

ললিত মোহন তখন শুষ্ক প্রাণ সরস করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা হইতে শ্বশুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিল।

হায় ললিত! তুমি বাঙ্গালীর অদৃষ্ট বুঝিতেছ না, তাহাই আজ আনন্দে আটখানা হইয়াছ। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তুমি ভবিষ্যতে

কি সুখের প্রার্থনা কর? তুমি এতদিন রাশি রাশি পুস্তক স্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া, সরস্বতীর আরাধনায় ধ্যানস্থ ছিলে, তুমি কখনও বাহিরে সংসারের সম্মুখে এস নাই; অনন্ত জ্বালাময়, অনন্ত দুঃখময়, সংসার তাপে দগ্ধ হও নাই। তখন তুমি কি বুঝিবে? কিন্তু এখন ধীরে ধীরে সংসারের দিকে অগ্রসর হইতেছ, এখন ধীরে ধীরে নীরবে নীরবে বুঝিবে এ সংসারে বাঙ্গালীর জীবন কি দুঃখময়। ললিত! উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত তুমি, কিন্তু কে আজ তোমার এ উচ্চশিক্ষার আদর করিবে? তোমার এত সাধনা অর্জ্জিত বাসনা, শ্রম সঞ্চিত বিদ্যাবলের কে গৌরব করিবে? ললিত! আজীবন ধরিয়া ভুল করিয়াছ। অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে গিয়া তুমি অত্যন্ত ভুল করিয়াছ। এ সংসারে অর্থ সাধনার বিনিময় মাত্র; কিন্তু তুমি যত সাধনা, যত পরিশ্রম করিয়াছ, জীবনে সে সাধনার বিনিময় পাইবে কি? বিশ্বাস হয় না। তবে একটী কথা বলি, ললিত! তোমার দোষ নয়, বাঙ্গালীর অদৃষ্টের দোষ, বাঙ্গালীর যেমন অদৃষ্ট, তেমনই সুখভোগ হইবে, তাহাতে পরিতাপ কি? এস, সংসার অভিমুখে ধীরে ধীরে এস, তাহার পর কর্ত্তব্য কর্ম্মস্রোতে শরীর ভাসাইয়া দাও, স্রোতের অনুকুলে যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও।

ললিত অনেকদিন হইল শ্বশুরালয়ে যায় নাই, তাহার স্ত্রী মাধবীলতা এখন প্রাপ্তবয়স্ক, বয়ক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে। ললিতের জীবনের এই মহানন্দের দিনে তাহার জীবন যাত্রার একমাত্র সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নী মাধবীলতার কথা মনে পড়িল; পড়িবারই কথা, কারণ স্বামীর সুখে দুঃখে স্ত্রীই একমাত্র অংশভাগিনী। অতএব ললিত তাহার পত্নীকে প্রাপ্তব্য অংশ কড়ায় গণ্ডায় বুঁঝিয়া দিবার জন্য সুখের ভরা বুকে করিয়া উর্দ্ধমুখে দ্রুতগতি শ্বশুর ভবনে ছুটিয়া চলিল।

(২)

রাধানগরের পরেশনাথ ঘোষ মহাশয়ের চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠা কুন্দলতা,

মধ্যমা অপরাজিতা, তৃতীয়া লবঙ্গলতা আর কনিষ্ঠা মাধবীলতা। পরেশ-নাথ ঘোষ কুলীন কায়স্থ, অবস্থা ভাল, তাঁহার কন্যা চারিটী অপূর্ব্ব সুন্দরী। , কিন্তু এই সুন্দরীগণের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা মাধবীলতা রূপে গুণে সর্ব্বপ্রধানা। মাধবীলতা ভিন্ন ঘোষ মহাশয়ের অপর তিন কন্যা অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে পড়িয়াছিল, কেবল কনিষ্ঠা কন্যা মাধবীলতাকে তিনি দরিদ্র তনয় ললিতমোহন মিত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ ছিল, ঘোষ মহাশয় মাধবীকে প্রাণসম স্নেহ করিতেন, অন্যান্য কন্যাগুলিকে যদিও বড়লোকের ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন জামাতা তাঁহার মনের মত হয় নাই, বড়লোকের সন্তান প্রায়ই মূর্খ হয়, তাহা ভিন্ন তাহারা দাম্ভিক ও কলুষিত চরিত্র ; সেই জন্য ঘোষ মহাশয় মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, মাধবীকে ধনীর সন্তানের হস্তে সমর্পণ করিবেন না, কোন দরিদ্র সচ্চরিত্র বিদ্বান যুবককে স্নেহের কন্যা মাধবীকে অর্পণ করিয়া সুখী হইবেন , সেই জন্যই তিনি বাছিয়া বাছিয়া সংসারের কোন অন্ধকার প্রদেশ হইতে ললিতমোহনের ন্যায় সুন্দর সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য উজ্জ্বল জামাতা রত্নকে বাহির করিয়া মাধবীলতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি সুযোগ্য পাত্রে মাধবীলতাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মাধবী যেমন রূপে গুণে চমৎকারা, লোলিতমোহনও সর্ব্বপ্রকারে তাহার উপযুক্ত ; "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"। অতএব ভগবান এ উপযুক্ত সম্মিলনই করিয়া দিয়াছিলেন।

ঘোষ মহাশয় কনিষ্ঠ জামাতা ললিতমোহনকে বড় স্নেহ করিতেন, সহস্রমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "ললিতের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জামাতা কার আছে ? তিনি অন্যান্য ধনী জামাতার উপর তাহাদের ব্যবহারে ও চরিত্রে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না। তাহাদের প্রশংসাও করিতেন না, তবে কাহাদের সমক্ষে কখন তাহাদের কুৎসাও করিতেন না। কিন্তু ঘোষ মহাশয় সর্ব্বদা সকলের সহিত ঘাঠে মাঠে

যেখানে সেখানে এক বাক্যে ললিতের প্রশংসা করিতেন। ললিত প্রশংসার যোগ্য পাত্র, কাজেই তিনি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহাতে একটী বিষময়ফল ফলিল।

ললিতের প্রতি এরূপ পক্ষপাতিতায় তাহার অন্যান্য কন্যাদের অন্তরে ঈর্ষার উদ্রেক হইল। তাহারা ভাবিল কেন মাধবীও মেয়ে আমরাও মেয়ে—তবে বাবার এ কি আক্কেল যে, তিনি মাধবীর স্বামীকে আমাদের স্বামীর অপেক্ষা ভালবাসিবেন—বেশী আদর যত্ন করিবেন! তিনি বলেন, আমাদের স্বামী মূর্খ, কিন্তু এ দোষ ত তাঁরই, কেন তিনি পণ্ডিত জামাই দেখে আমাদের বিবাহ দেন নাই?"

বাস্তবিক এরূপ ঈর্ষা হইবারই কথা। পিতা মাতার নিকট সকল সন্তাই সমান আদর, যত্ন, ভালবাসা প্রার্থনা করে, তবে ঘোষ মহাশয় এরূপ ব্যবহার কেন করেন? কাজেই ভগ্নীদিগের অন্তরে বড়ই ক্রোধের সঞ্চার হইল, তাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে প্রকারেই হউক মাধবীর উপর ইহার প্রতিশোধ লইব।

ললিত সহাস্যমুখে শ্বশুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া ঘোষ মহাশয় তাঁহার পত্নী এবং মাধবীলতা পরমানন্দ লাভ করিল; কিন্তু মাধবীর অন্যান্য ভগ্নীগণ তাহাতে ঈর্ষায় অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল। ললিতের আর আদরের সীমা নাই;—কৃতবিদ্য জামাতার আহারাদির জন্য শ্বশুর শাশুড়ী নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতেছে। প্রতিবাসীরা ঘোষেদের ছোট জামাইয়ের কত প্রশংসা করিতেছে। দাস দাসীরা জামাই বাবুকে প্রাণ-পণে সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, কিন্তু হায়! ইহাতে ভগ্নীগণের অন্তরে যেন কালাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু কি করিবে? তাহারা অন্তরের ভাব অন্তরে গোপন করিয়া মুখে ললিতমোহনের সহিত সদালাপ করিতে লাগিল।

তিন ভগ্নী কি যুক্তি করিয়া এক সময়ে মাধবীকে ডাকিল। মাধবী আজ স্বামীর সুযশে, স্বামীর আদর যত্নে একেবারে আনন্দে, মাতিয়া উঠিয়াছে, সে হাসিতে হাসিতে ভগ্নীদিগের নিকটে গিয়া বলিল, "ডাক্‌ছ কেন দিদি" ?

কুন্দ বলিল, "ডাক্‌ছি, তুই যে ডুমুরের ফুল হয়ে পড়্‌লি দেখ্‌ছি—বলি আমাদের কি স্বামী নেই? রাত্রি দিন কাছে কাছে থাক্‌বি, ব্যাপার খানা কি ?"

মাধবী লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তখন অপরাজিতা মাধবীর হাত ধরিয়া বলিল, "আয় তাস খেলি গিয়ে।"

মাধবীর যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু সে কি করিবে, অনিচ্ছা সত্বেও ভগ্নীদিগের সঙ্গে তাস্ খেলিতে গেল। মাধবীলতা নিতান্ত শান্ত সুশীল, ভগ্নীদিগের মত তাহার হৃদয়ে কোন কপটতা, কোন শঠতা বা ঈর্ষা ছিল না। মাধবীলতা অন্যমনস্কভাবে খেলিতে লাগিল। বিপক্ষ রঙ্গের গোলাম খেলিল, মাধবী রঙ্গের দশখানি হাতে রাখিয়া রঙ্গের নয় দিল—পরবারে সে দশখানিও ধরাপড়িল; তখন স্বপক্ষ ভগ্নী মাধবীর উপর চটিয়া লাল হইল। সে মাধবীকে ধমকাইয়া বলিল, "দূর পোড়ারমুখি! সব পাল্টে ফেল্‌লি।"

মাধবীর প্রাণের মধ্যে তখন কত কি উল্‌টপালট্ হইতেছে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সে খেলা করিতেছে, তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; তখন সে বলিল, "দিদি! আমি খেল্‌বনা।"

কুন্দ। কেন—কি হ'ল ?

মাধবী। আমার বড় ভুল হয়ে যাচ্চে।

লবঙ্গলতা হাসিয়া বলিল, "তা হবে বৈকি, মাধবীর মন ত আর মাধবীর কাছে নেই, ললিত বাবুর চারি পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে"।

অপরাজিতা বলিল, "তা না খেলিস্, গল্প করি আয়।"

তখন এ গল্প সে গল্প কত গল্প হইল ; মাধবী কিন্তু কোন গল্পই শুনিল না। কুন্দলতা বলিল, "আমি একবার পাঁচ শত টাকার সোণার কণ্ঠী নিব বলে দিয়েছি—পূজার সময় পাব।"

অপরাজিতা বলিল, "আমিও বলে দিয়েছি।"

লবঙ্গলতা বলিল, "তোমরা সোনার কণ্ঠী পর্‌বে, আমি বুঝি ফাঁকে পড়্‌ব মনে করেছ ? আমি কালই চিঠি লিখে দেব।"

কুন্দ বলিল, "তা ভাই, আমাদের সবারই হবে কিন্তু মাধবীর কিছুই হবে না।"

অপরাজিতা। কেন হ'বেনা দিদি ? মাধবীর এমন বিদ্বান্ গুণবান্ স্বামী রয়েছে, মাধবীর হবে না কেন ?

লবঙ্গ। ওর আর হবে কোথা হ'তে ? নিতান্ত গরীবের হাতে পড়েছে, আজ খায় এমন জোগাড় নেই, শুধু বিদ্যে নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ? আহা—ওদের বড় কষ্ট।

ভগ্নীদিগের এ সহানুভূতি মাধবীলতার ভাল লাগিল না—তাহাদের কথায় তাহার প্রাণে যেন কেমন আঘাত লাগিল। মাধবীলতা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন কুন্দলতা আরও যেন দুঃখিত হইয়া বলিল, "মাধি! তোর মনে বড় কষ্ট হচ্ছে, না? তা কি করবি বোন, তোর যেমন মন্দ কপাল।"

আগুন জ্বলিল—মাধবীলতা তাহার মন্দ কপাল লইয়া উঠিয়া গেল—ভগ্নীগণ বুঝিল তাহারা বেশ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

(৩)

মাধবীলতা শয্যার উপর গিয়া বসিল, বসিয়া চিন্তা করিল যে দিদি-দের সোনার কণ্ঠী হবে, পূজার সময় পর্‌বে ; আমি পর্‌তে পাব না ? তা হবে না—আমিও সোনার কণ্ঠী লইব। কেন লইব না—আমার স্বামী

বিদ্বান্, আমার স্বামী সকলের চেয়ে ভাল, তবে আমি কেন পাইব না? আমার স্বামীর মত স্বামী কার আছে? আমি দিদিদের চেয়ে ভাল কণ্ঠী নিব—হাজার টাকার কণ্ঠী নিব—তখন দিদিরা বুঝ্‌বে, আমার কপাল মন্দ কি তাদের কপাল মন্দ।”

ললিতমোহন এই সময় গৃহে আসিয়া আদর করিয়া মাধবীকে বুকে ধরিল—শতবার তাহার মুখচুম্বন করিল। মাধবী হাসিয়া আদর করিয়া বলিল, “দেখ আমি কখনও তোমার কাছে কিছু চাই নাই, কিন্তু এবার আমার একটী আব্দার শুন্‌তে হবে।”

ললিতমোহন আগ্রহভরে বলিল, “কি আব্দার তোমার?”

মাধবী বলিল, “এবার পূজার সময়ে আমাকে হাজার টাকার সোনার কণ্ঠী গড়িয়ে দিতে হবে।”

“হাজার টাকার সোনার কণ্ঠী!” শুনিয়া ললিতমোহন চমকিত হইয়া উঠিল। দরিদ্র সন্তান ললিতমোহন হাজার টাকা কোথায় পাইবে! সে বিস্ময়ে বলিল, “হাজার টাকা! এত টাকা কোথায় পাব?”

“কেন, পাবে না কেন? তুমি এত বিদ্যে শিখেছ—লোকে তোমার কত সুখ্যাতি করে, তুমি আমাকে হাজার টাকার সোনার কণ্ঠী দিতে পারবে না?”

“মাধবি! বিদ্যে শিখেছি বটে কিন্তু এখন তোমাকে হাজার টাকার কণ্ঠী দিতে হ’লে আমাকে আর একটী বিদ্যে শিখ্‌তে হবে।”

“কি বিদ্যে?”

“চুরি বিদ্যে—চুরি না কর্‌লে উপস্থিত হাজার টাকা কোথায় পাব?”

মাধবী বিরক্ত হইয়া বলিল “আঃ ছিঃ! আমি কি তোমাকে চুরি করতে বল্‌ছি?”

“বলছ বৈকি? তুমি ত আমার অবস্থা জান—তোমার জ্ঞান হয়েছে; জেনে শুনে এ অন্যায় আব্দার কেন?”

"না তা আমি শুন্‌ব না, তোমাকে দিতেই হবে। পূজার সময় দিদিরা সোনার কণ্ঠী পর্‌বে, আমি পর্‌ব না?"

"তোমার দিদিরা দোতলায় বাস করে, তুমি খড়ের ঘরে থাক কেন?"

"কেন আমার কি দোতালা বাড়ী হবে না মনে করেছ? তোমার মত স্বামী যার, তার রাজ-অট্টালিকা হয়।"

ললিতমোহন বুঝিল, "মন্দ নয়, আমার স্ত্রীর বিশ্বাস আমার পেটে অগাধ বিদ্যা। বিদ্যা থাক্‌লেই টাকা আসে, এটা সাধারণের বিশ্বাস, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। টাকা আসুক বা না আসুক, টাকা থাক্‌ বা না থাক্‌, তা বলে স্ত্রীর নিকট কি আজ নিতান্ত হীনতা স্বীকার কর্‌ব? মাধবী জীবনে এত দিন কখনও আমার নিকটে কোন আব্দার করে নাই, কারণ সে জানিত আমি লেখা পড়া করি, টাকা কোথায় পাব। কিন্তু আজ সে আমাকে বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ কৃতবিদ্য স্বামী জেনে এ আব্দার কর্‌ছে, আমি তার এ প্রথম আব্দার হতাদর কর্‌ব? না—কখনই হতে পারে না। তার দিদিরা সোনাদানা পরে, সুতরাং মাধবীর মনে এ সাধ ত হতেই পারে—কার না হয়? কিন্তু হায়! আমি আজ এত টাকা কোথায় পাইব?" ললিতমোহন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না, চিন্তিত মনে বসিয়া রহিল।

মাধবী বলিল "তুমি ভাব্‌ছ কি, দিতে পার্‌বে না?"

ললিতমোহন আগ্রহ সহকারে বলিল, "পার্‌ব বই কি?"

মাধবীর মুখখানি অমনি প্রফুল্লতর হইল, সে আনন্দে হাসিয়া বলিল, "পূজার সময় হাজার টাকার কণ্ঠী দিবে?"

ললিত। দিব।

মাধবী। ঠিক দিবে?

ললিত। ঠিক দিব।

সহসা মাধবীর কি যেন মনে হইল, সে বলিল, "দিবে বলছ, কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবে ?"

ললিত। কেন মাধবি ! আমার কথায় বিশ্বাস হচ্চে না ? আমি যেখান হ'তে পারি এনে দিব।

ললিতমোহনের কথা শুনিয়া মাধবীর প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—সে বলিল, "বিশ্বাস হবে না কেন ? কিন্তু কাজ নাই, আমি কণ্ঠী চাইনা।"

ললিত মাধবীলতার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, তখন সে সাদরে মাধবীকে আলিঙ্গনাবাদ করিয়া মুখচুম্বন করিল, তাহার পর বলিল, "আদরিণি ! তুমি এত বড় হয়েছ, তবুও জীবনে আমার নিকটে কোন আব্দার কর নাই। আমি এখন বিদ্বান্ হয়েছি, তোমার এ সামান্য আব্দারটা শুনব না ?"

মাধবী বাধা দিয়া বলিল, "না না আমার আব্দারে কার্য্য নাই—তুমি অন্য সময়ে পার ত দিও।"

আজ বৈশাখ মাসের শেষ দিন, এখনও পূজা পাঁচ মাস বাকি। পাঁচ মাসের মধ্যে ত দিন কয়েক এদিক ওদিক যাবে তাহা হ'লে ঠিক চারি মাস। এই চারি মাসের মধ্যে হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, অর্থাৎ মাসে আড়াই শত মুদ্রা এবং তাহা ছাড়া নিজের খরচ আছে। ললিতমোহন ভাবিয়া ঠিক পাইল না যে, কি উপায়ে সে এত টাকা সংগ্রহ করিবে। ভাবিতে ভাবিতে ললিতমোহন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল—কলিকাতায় একজন রাজপুত্রকে প্রাইভেট্ পড়াইয়া ললিতমোহন মাসে চল্লিশ টাকা পাইত। ইহাই এখন তাহার একমাত্র সম্বল। বাকি দুই শত দশ টাকা ও নিজের ব্যয়। সর্ব্বনাশ এত টাকা কি কখনও উপায় করা যায় ? কিন্তু ললিতমোহন হতশ্বাস হইল না, সে ভাবিল "যদ্ ভাবী তদ্ ভবেৎ ভবেচ্চেন্নতদন্যথা ইতি চিন্তা বিষঘ্নমগধং কিন্ন পিয়তে।" যা হবার তা হবে দেখা যাক্ কি হয়।"

এই ভাবিয়া চিন্তিয়া ললিতমোহন কলিকাতা সহরে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। ললিত ভাবিল, "যদি কোন স্কুলে মাষ্টারী করি, তাহা হ'লে মাসে বড় জোর আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিবে—তাতে কি হবে, মাষ্টারী করিব না। ব্যবসাতে অনেক পয়সা উপায় হয় বটে কিন্তু তাহাতে নগদ পুঁজি চাই—তাহাও হবে না—তবে হবে কি? আফিসে চাকুরী করতে গেলে এখনই বল্‌বে আগে কাজ শিক্ষা কর কিন্তু ততদিন আমার সবুর সয় কই? আর আফিসে চাকুরী করতে গেলে দুই শত টাকা আমাকে কে বেতন দিবে?" ললিত বড়ই মুস্কিলে পড়িল। ললিত আবার ভাবিল, "এই কলিকাতা সহরে কত মূর্খ লোকে দিন দুই শত কি দুই সহস্র মুদ্রা উপায় করিতেছে; কিন্তু হায়! আমি এ লেখাপড়া শিখিয়াও মাসে আড়াই শত মুদ্রা উপায় করিতে পারিব না? হায়! তবে কি এ বাঙ্গালায় বিদ্যার আদর নাই। তবে আমি এতদিন এত কঠোর পরিশ্রমে কি বিদ্যা উপার্জ্জন কর্‌লেম?

একদিন ললিত কি ভাবিয়া চিন্তিয়া ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর আফিসে গিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর আফিসের বড়সাহেব মিঃ ক্যাম্বেলের নিকট গিয়া দর্শন দিল। সাহেবটী অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, ললিতমোহনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বাবু কি চাও?"

ললিত কহিল "সাহেব, আমি আপনার নিকটে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।"

সাহেব আগ্রহভরে বলিলেন, "কি প্রয়োজন বাবু! তুমি কি কোন সওদাগর?"

ললিত নম্রভাবে বলিল, আজ্ঞে না;—আপনার কাছে চাকুরীর প্রার্থনায় এসেছি।"

শুনিয়া বড়সাহেব বিরক্তভাবে বলিলেন, "ও বাবু! তুমি চাকুরীর জন্য

এসেছ ? কেন.ফটকে 'No vacancy' (খালি নাই) লেখা আছে, দেখ্‌তে পাও নাই ?"

বিনীতভাবে ললিত বলিল, "সাহেব ! আমিত মান্ধাতার আমল হতেই দেখ্‌ছি, সকল আফিসের ফটকে 'No vacancy' লেখা থাকে, তবে বৎসর বৎসর লোকে এত চাকুরী পায় কোথা হ'তে ?"

মিঃ ক্যাম্বেল সদালাপী ভদ্রলোক ছিলেন, ললিতের বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাবু বস, তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী যুবক বলে বোধ হচ্ছে। দেখ বাবু, তোমাদের এ বাঙ্গালাদেশে চাকুরে মৌমাছির এত দৌরাত্ম্য যে, ঐরূপ কোন একটা পথ অবলম্বন না কর্‌লে মৌমাছির ভন্‌ভনানিতে জ্বালাতন হয়ে পড়্‌তে হয়।"

ললিতমোহন বলিল, "হ্যা সাহেব ! আপনি ঠিক বলেছেন ; বাঙ্গালী এতদূর চাকুরীপ্রিয় বলেই ত তাদের এত অধঃপতন। কিন্তু সাহেব ! এখন যে আমি পেটের জ্বালায় ম'রে যাই—আপনি দয়া করে আমায় উপস্থিত একটি কাজ দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, পূজার পর আর চাকুরী কর্‌ব না। আমি কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রাণপাত কর্‌ব।"

ললিতমোহনের সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া তাহার উপর সাহেবের কেমন দয়া হইল, সাহেব বলিলেন, "বাবু উপস্থিত যদি তোমার নিতান্ত চাকুরীর প্রয়োজন হয়, তবে আপাততঃ এই কয় মাসের জন্য তোমাকে একটী দুই শত টাকা বেতনের চাকুরী দিতে পারি। আমার একজন এসিষ্টাণ্ট কিছু দিনের জন্য ছুটী লইবে। আমার বিবেচনায় তুমি এ কয়মাস সে কাজ চালাতে পার্‌বে। বাবু ! তাহা হ'লে তুমি আজ যাও—কাল এস !"

ললিতমোহন বুঝিল তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উপস্থিত দুই শত চল্লিশ টাকা মাসিক আয় হইল, আরও কিছু চাই।

(৫)

ললিতমোহন বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ম্যাকেঞ্জী সাহেবের আফিসে চাকুরী করে। রাত্রি ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রাজার বাটীতে ছেলে পড়ায়! প্রাতেও আর একটী ছেলে পড়ান জুটিল। সেখানে সবে মাত্র কুড়ি টাকা হয়! যাহা হউক এই প্রকারে মাসে মাসে আড়াই শত টাকা সঞ্চিত করিয়া দশ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতেই ললিত হোটেলে খাইয়া খোলার ঘরে থাকিয়া, অতি কষ্টে জীবনযাপন করিত। ক্রমাগত চারিমাস কাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ললিতমোহন হাজার টাকা সংগ্রহ করিল। সেই হাজার টাকা লইয়া প্রিয়তমা পত্নী মাধবী-লতার জন্য সোনার কণ্ঠী নির্ম্মাণ করাইল, ললিতের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে ললিতের শরীর জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল—দিন দিন তাহার শরীরে যেন কেমন অবসন্নভাব আসিতে লাগিল। পূজার আর বিলম্ব নাই, ললিত-মোহন কালবিলম্ব না করিয়া সেই সোনার কণ্ঠী লইয়া শ্বশুরালয় অভি-মুখে ধাবিত হইল।

পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাকালে পরেশনাথ ঘোষ তাহার বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে এমন সময়ে ললিতমোহন একটী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘোষ মহাশয় চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে আপনি?"

ললিত শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমি ললিত।"

ঘোষ মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ললিত! একি তোমার শরীর এমন শীর্ণ, মুখখানি এমন শুষ্ক কেন? তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে। তোমার চেহারা দেখ্‌লে তোমাকে আর চেনা যায় না।"

ললিত বলিল, "না, আমার অন্য কোন অসুখ নাই তবে উপস্থিত শরীরে যেন জ্বরভাব বোধ হচ্ছে।"

তখন' কর্ত্তা ললিতকে সঙ্গে করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া উপস্থিত হইল।

ললিত একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছে এমন সময়ে হাসিতে হাসিতে তাহার প্রিয়তমা পত্নী মাধবীলতা তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধবীলতা অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক ললিতের দিকে তাকাইল, তাহার পর চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ললিত তাড়াতাড়ি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ খুলিয়া সোনার কণ্ঠী বাহির করিয়া মাধবীলতার কণ্ঠে পরাইয়া দিল, তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই নাও তোমার আব্দার।" এই বলিয়াই ললিতমোহন ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিল, মাধবী বিস্ময়ে ভয়ে বলিল, "ও কি শুচ্ছ কেন?"

ললিত। কহিল, "আমার অসুখ হয়েছে।"

ব্যাগ্রভাবে মাধবী বলিল, "য়্যা অসুখ করেছে, কি অসুখ? ওকি কাস্‌ছ কেন?"

ললিত বলিল, "বুকে বড় সর্দ্দি জমেছে।"

সোনার কণ্ঠী গলদেশ হইতে উত্তোলন করিয়া মাধবীলতা ভূমিতে ফেলিয়া দিল, তার পর ছুটিয়া ললিতের পার্শ্বে গিয়া বসিল। মাধবী তাহার গায়ে হাত দিল—গাত্রে কি অগ্নি—মাধবীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার জননীকে সংবাদ দিল—জননী ছুটিয়া আসিল, দেখিল, ললিতমোহনের অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে।

মাধবী দিন রাত্রি পার্শ্বে বসিয়া ললিতমোহনের সেবা করিতে লাগিল। ঘোষ মহাশয় ডাক্তার ডাকিলেন, একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ললিতমোহনকে চিকিৎসা করিতে লাগিল। দুই দিবসের পর ডাক্তার

বিষন্ন বদনে ঘোষ মহাশয়কে বলিলেন, "মহাশয়! অবস্থা শোচনীয়, ডবল নিউমনিয়া, আপনি অন্য উপায় দেখুন।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া ঘোষ মহাশয়ের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী এম, বি, ডাক্তার আনিলেন, কিন্তু হায়! সে ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। তখন মাধবীলতা তাহার যাবতীয় অলঙ্কার রাশি ও সোণার কন্ঠী সমস্তই লইয়া তাহার মাতার পদতলে আনিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মা! আমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে তুমি বাবাকে কলিকাতা থেকে সাহেব ডাক্তার নিয়ে আস্‌তে বল।"

কিন্তু হায়! যেখানকার অলঙ্কার সেইখানেই রহিল—যেখানকার আব্দার সেইখানেই রহিল—যেখানকার যা কিছু সেইখানেই সব পড়িয়া রহিল—ভগ্নীদের বুকের ঈর্ষা বুকেই রহিল—মাধবীলতার মুখের আব্দার মুখেই রহিল—কেবল ধীরে ধীরে নীরবে নীরবে মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাইয়া, ললিতমোহন এ ঈর্ষা হিংসা প্রতারণাময় জগত হইতে চির-দিনের মত প্রস্থান করিল। ললিত চলিয়া গেল, অমনি বাতাহত কদলীর ন্যায় উন্মাদিনী মাধবীলতা ললিতের মৃতদেহের উপর পড়িল—তাহার পর সকলে মাধবীলতাকে তুলিয়া দেখিল যে, সেই সর্ব্বসৌভাগ্য-বতী সতী-শিরোমণি মাধবীলতা পতিসঙ্গে মহাপ্রস্থান করিয়াছে।

অনুপমা

(সমাজ চিত্র)

অতুল রূপের অধিকারিণী করিয়া, বিধাতা অনুপমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন চাঁপা ফুলের ন্যায় রং, তেমন সুগোল গঠন। বয়স তের ছাড়িয়া চৌদ্দতে পড়িয়াছে, ইহারই মধ্যে বর্ণের উজ্জ্বলতায়, গড়নের পারিপাট্যে, সৌন্দর্য্য প্রভা যেন সহস্র ধারে বিকীর্ণ হইতেছে। ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ কলাপ, ভাসা ভাসা চক্ষুদ্বয়, তাহার সৌন্দর্য্য অধিকতর রূপে বর্দ্ধন করিতেছে। অর্দ্ধ উন্মুক্ত কুসুম কলিকার ন্যায় যৌবন আবির্ভাবে অনুপমার সৌন্দর্য্যশ্রী উথলিয়া উঠিয়াছে, সে সৌন্দর্য্য—সে লাবণ্য—বড়ই সুন্দর।

হারাধন দত্ত অনুপমার পিতা। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রায়পুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে দত্তজার বাস। গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন উচ্চ কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, উপস্থিত সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় বিষয় কর্ম্ম, পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। পরোপকারী ও মিষ্ট ভাষী বলিয়া অনেকে দত্তজার প্রশংসা করিত। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত সাধারণের মতের তত সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার নব ভাব জাগাইয়া তুলিতেন। প্রতিমা পূজা কুরুচির পরিচায়ক বলিয়া তাঁহাকে কখনও কোন দেবতার নিকট মস্তক অবনত করিতে দেখা যায় নাই। পৈত্রিক হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইত, উহা অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া তাহা পরি-

ত্যাগ করিয়াছিলেন। জাতি ভেদ আদৌ স্বীকার করিতেন না, বাল্য বিবাহকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

দত্তজার পত্নী হরসুন্দরী এক বৎসর বয়স্কা কন্যা রাখিয়া, পরলোক গমন করেন, মৃত্যুকালে তিনি স্বামীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "সংসারে অনুপমাকে আদর যত্ন করিবার কেহ নাই, বড় আশা ছিল কন্যা রত্নটীকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিব, বিধাতা আমার সে আশায় বিমুখ করিলেন, আমি চলিলাম, তুমি আমার স্থানীয় হইয়া, উহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিও, দেখিও আমার জীবনের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে কদাচ শৈথিল্য করিও না।"

হরসুন্দরীর অন্তিম অনুরোধ দত্তজা উপেক্ষা করেন নাই। তিনি অনুপমাকে, আদরে লালনপালন করিয়া, যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

কয়েক খানা বাঙ্গলা বই অধ্যয়ন করিয়া, অনুপমা একটু একটু ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিল। অবসর পাইলে সাময়িক পত্রে প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ কবিতা লিখিয়া শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিত। কখনও বা হারমোনিয়মের সহিত কল কণ্ঠ নিনাদিত করিয়া, সুস্বর লহরীতে দিগন্ত কাঁপাইয়া শ্রোতৃবর্গের অন্তরে উদাস ভাব জাগাইয়া তুলিত।

স্নেহ মায়া বিজড়িত হইয়া দত্তজা এযাবৎ কন্যার বিবাহ দেন নাই, কিন্তু পাড়ার লোকে বলিত এত অল্প বয়সে কন্যা সম্প্রদান করিতে দত্তজা নারাজ। এজন্য অনুপমা অবিবাহিতা।

বয়স যায় না জল যায়, একে মেয়েরঁ বাড়ন্ত গড়ন, ইহারই মধ্যে অনুপমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বালিকা সুলভ চাপল্যতা তিরোহিত হইয়া যৌবনের উদ্গম হইয়াছে, ক্ষীণ অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সারল্য তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে।

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ আজানিত প্রদেশ হইতে এক গুপ্ত পিপাসা তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে,সে অতৃপ্ত কামনা অনুপমার মর্ম্মস্থলে প্রবলবেগে মুহুর্মুহু ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে, সে আঘাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক উদ্ভ্রান্ত ভাবের অবতারণা করিয়া তুলিয়াছে। অনুপমা নিজে তাহা বুঝিতে অসমর্থ, উহা কল্পনার বহির্ভূত—ধারণার অতীত।

যে যৌবন মানুষকে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য করে, যে যৌবনের সমাগমে মানবের কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি উদ্দীপ্ত হয়, যে যৌবন, ধর্ম্ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে, যে যৌবন, ভোগ লালসাবৃত্তি চরিতার্থের জন্য, মানসিক বৃত্তি গুলিকে বলবতী করে, যে যৌবন, বাত্যা বিক্ষুব্ধ বারি রাশির ন্যায় প্রবৃত্তি সমূহকে আলোড়িত করিয়া থাকে, সেই যৌবনের সন্ধিস্থানে অনুপমা উপস্থিত। যৌবন সমাগমে তাহার চিত্ত পদ্মপত্রস্থ জল কণিকার ন্যায় চঞ্চল, দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি রাশি জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসবৎ বলবতী।

প্রবৃত্তির তাড়নায়, অনুপমার হৃদয় যখন উদাস বিহ্বল করিয়া তুলিত, তখন সে নির্জ্জনে আপনার কলকণ্ঠ হারমোনিয়মের সহিত মিলাইয়া, মধুর সঙ্গীত স্রোতে চতুর্দ্দিক উদ্বেলিত করিয়া, হৃদয়ে এক মধুর মোহ ঢালিয়া দিত।

দত্তজার বিংশ বর্ষীয় ভৃত্য ফটিকচাঁদ, অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে, নির্নিমেষ নয়নে, অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া, সে মধুর সঙ্গীত শ্রবণে বিভোর হইয়া পড়িত।

অনুপমা দেখিত, তাহার আকুল সঙ্গীতের মর্ম্মগ্রাহী মর্ম্মব্যথার একমাত্র ব্যথী ফটিকচাঁদ। সুতরাং তাহার প্রতি ঘনিষ্টতা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। একই স্রোতে উভয়ে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং একই উদ্দেশে উভয়ের হৃদয় পরিচালিত হইতেছে, কাজেই চুম্বকের আকর্ষনের ন্যায় দুটী হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

যে দিন ফটিকের কাতর চাহনি, অনুপমার দৃষ্টি পথে নিপতিত হইল, সেইদিন, সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় ভাবে তন্ময় হইয়া উঠিল। প্রণয় প্রবাহ হৃদয় ভেদ করিয়া, আকুল ও উন্মত্ত করিয়া তুলিল। অনুপমা আত্মহারা হইয়া গেল, সংসার তাহার নিকট শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সমবয়স্কদের সহিত হাস্যালাপে অনুপমার সন্তোষ উৎপাদন করে না। কোন কার্য্যে আসক্তি জন্মে না। সর্ব্বদা যেন উদ্ভ্রান্ত ভাব আসিয়া তাহাকে উদাস করিয়া তুলে।

ক্রমে সে, সম বয়স্কদের সঙ্গ ত্যাগ করিল। তাহাদের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। সর্ব্বদা অশান্তি পূর্ণ চিত্তে নির্জ্জনে থাকিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কাহারও কথার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিত না। অবস্থা দৃষ্টে কেহ বুঝিতে পারিল না যে, অনুপমা বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিষের ক্রিয়া বিকাশ পাইতে লাগিল, কেহ তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায়, দুটী অপরিচিত হৃদয় মিলিয়া এক হইয়া গেল।

আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া মানুষ জগতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহার শেষ কোথায় কেহ জানে না। যতই আশার তৃপ্তি হইতে থাকে ততই কামনা বাড়িয়া উঠে, আজীবন কষ্ট—তবু তৃপ্তি সম্পাদিত হয় না। সমুদ্র বক্ষোত্থিত, অগনন তরঙ্গমালার ন্যায়, অসংখ্য বাসনারাশি হৃদয়ে উত্থিত হইয়া, মানুষকে পরিচালিত করে। ইহার অন্ত নাই, শেষ নাই। মানুষও আকাঙ্ক্ষার দাস। অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মৃত্যু শয্যায় শায়িত, আসন্ন মৃত্যু তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান, তবুও জীবনের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে চাহে না। নবজীবন লাভ করিয়া সংসারে সুখের কামনা মিটাইবে, এ সাধ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। অনুপমা কোন প্রাণে, জীবনের প্রভাত সময়ে, তাহার সুখের সংকল্প ত্যাগ করিবে?

যাহাকে পাইলে পূর্ব্বে সে, সুখী হইবে বলিয়া সুখের কল্পনা করিত, এখন তাহাকে হৃদয়ের অধিশ্বর করিয়া, ভালবাসা কুসুমে অর্চ্চনা করিয়াও সুখের পূর্ণতা লাভ হয় না ;—অতৃপ্ত কামনা মিটে না।

মনে করে এত সংগোপনে পাইলে কি সুখ? যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিলাম, যাহার উদ্দেশ্যে এ ক্ষুদ্র প্রাণ বলিদান করিলাম ; তাহাকে লইয়া একবৃন্তে প্রস্ফুটিত দুটী কুসুমের ন্যায় শোভা পাই না কেন? যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না কেন? যদি পায়, দুটী হৃদয় সম্মিলিত হইয়া থাকিতে পারে না কেন? প্রণয়ী যুগলের নিকট সমাজের বন্ধন এত কঠোর কেন? অনন্ত ভাবনা স্রোত, সর্ব্বদা অন্তরে জাগরিত থাকিয়া, বিরহ ব্যথা ক্লিষ্ট অনুপমাকে বড়ই ব্যাকুলিত ও বিদ্ধস্ত করিয়া তুলিয়াছে। অবশেষ স্থির করিল, যে স্থানে থাকিলে পদে পদে সন্দেহ, আশঙ্কা ও লোক নিন্দার ভয় বর্ত্তমান, সে স্থানে থাকিয়া আর অশান্তি পূর্ণ হৃদয়ে বাস করিব না। পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায়, বদ্ধ থাকিয়া স্বাধীন প্রেমের অপচয় করিব না। সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, যাহাতে সুখে বিচরণ করিতে পারি তাহা করিব।

অবশেষ অনুপমা তাহাই করিল। লোক নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া, লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া, ফটিককে জীবনের সহচর করিয়া স্বাধীন সুখের অন্বেষণে, সকলের অজানিত ভাবে, সংসার ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

(৪)

সুখের প্রহেলিকায়, সংসারে সকলেই ঘুরিয়া বেড়ায়, সুখ যে কি জিনিস কেহ তাহা জানেনা, ইহার অস্তিত্ব কি তাহাও বলিতে পারে না। অথচ এ অজানিত জিনিস পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে লালায়িত। ধনী হইতে কপর্দ্দক বিহীন ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের অন্তরে, সুখের কামনা

জাগরিত। কিন্তু কে যে সুখী, তাহার কোন প্রকৃত মীমাংসা করিতে এযাবৎ কেহ সমর্থ হন নাই।

যুবক প্রফুল্ল শতদলবৎ রমণীর সৌন্দর্য্য উপভোগে যে সুখানুভব করে, বৃদ্ধের পক্ষে উহা অশেষ যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া অনুমিত হয়। বিষয় বৈভব ধনীর পক্ষে যেরূপ সুখময় বিবেচিত হয় অথচ সংসার ত্যাগী যোগীর পক্ষে উহা লোষ্ট্রবৎ পরিত্যক্ত ও অশান্তির আকর। সুতরাং প্রকৃত সুখ যে কি, কেন যে লোক সুখের আশায় ছুটাছুটি করে তাহার সম্যক তত্ত্ব নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার!

যে সুখের কামনায় অনুপমাও ফটিকচাঁদ সংসারের ও সমাজের বন্ধন অতিক্রমণ করিয়া, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে তাহারা কি সুখী? যদিও উহারা পাড়াগাঁ ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছে, কলিকাতার এক নিভৃত কুটীরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সৌধপরিপূর্ণ কোলাহল-ময়ী নগরীর, জনসঙ্ঘ দর্শন করিতেছে, উহাতে অন্তরে সুখের আবির্ভাব হইয়াছে কি? কে বলিতে পারে?

অর্থ, কড়ি, গহনা পত্র যাহা কিছু সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তদ্বারা উভয়ের খরচ পত্র ও ঘরভাড়া চলিতেছে। এরূপভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল, সুতরাং অভাবজনিত কষ্টে এ যাবত উহারা উৎপীড়িত হয় নাই। কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে আর কত সময় থাকে? সামান্য অর্থ ব্যয়িত হইয়া, নিঃশেষ প্রায় হইতে লাগিল। কষ্টেস্বষ্টে আরও দুই বৎসর কাটাইল। এই সময়ে অনুপমা একটী পুত্র প্রসব করিল। সুতরাং ব্যয়াধিক্যের আরও একটু কারণ ঘটিল। নবজাত শিশুর পথ্য দুগ্ধ প্রভৃতি ব্যয় বাহুল্যতায় যে কিছু অর্থ ছিল সমস্ত ফুরাইয়া গেল।

যে দুই একখানা গহনা ছিল তাহা বন্ধক পড়িল, তৎপর ধার আরম্ভ হইল, এরূপভাবে আর কতদিন চলে? ক্রমে ধার পাওয়া বন্ধ হইল।

এক ঋণ পরিশোধ না করিলে কে ধার দিবে? বন্ধকী গহনা বিক্রয় করিয়াও সমস্ত দেনা পরিশোধ হইল না। আবশ্যকীয় তৈজসপত্র যাহা ছিল ক্রমে,তাহাও বিক্রয় করিয়া দিন চলিতে লাগিল। তৎপর আর দিন চলে না, তাহার উপর মাহাজনের কড়া কড়া তাগাদায় উভয়কে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। ফটিক মনে মনে বড় প্রমাদ গণিল। যে মোহে এতদিন সে বিমুগ্ধ ছিল এখন তাহার সে মোহ কাটিয়াছে।

পূর্ব্বের ন্যায় অনুপমার এখন আর সে লাবণ্য নাই, বিদ্যুৎবৎ কটাক্ষের সে চাহনি নাই, মুখের সে উজ্জ্বলতা নাই, সব যেন মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। যৌবনের সে রূপ থাকিবে কেন? জীবন, যৌবন ইহারা ত চিরস্থায়ী নয়, স্রোতের জলের ন্যায় আসে আবার মিলাইয়া যায়। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী অনুপমা প্রৌঢ়াবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার যৌবনের মাধুর্য্যতাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার উপর দারিদ্র রাক্ষসী পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, তৈল অভাবে কেশ রুক্ষ, চিন্তায় শরীর শীর্ণ, খাদ্যাভাবে মুখ মলিন ও শুষ্ক। পূর্ব্বের সে মনমোহিনী রূপ আর অনুপমার নাই, দেখিলে তাহাকে চেনা কষ্টকর। যে যৌবনমাধুর্য্যে ফটিক বিমুগ্ধ ছিল, এখন আর সে মুগ্ধতা নাই, তাহার উপর অভাবের কশাঘাত। ফটিক অস্থির হইয়া উঠিল, অবশেষে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গভীর রজনীতে সুষুপ্ত অনুপমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

(৫)

বাসন্তী রাণীর প্রভাত সমাগমে, অনুপমা জাগরিত হইয়া দেখিল, তাহার আশালতা বিক্ষুব্ধ প্রভঞ্জনের প্রবল আঘাতে ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপাটিত হইয়াছে। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া, পিতৃস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়া সুখের কামনায়, সংসারকে স্বর্গে পরিণত

করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, আজ সেই হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন, তাহাকে জীর্ণ পরিধেয়ের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যখন জীবনে নব যৌবনের উদ্গম হইয়াছিল, যখন হৃদয়ে আশার বীণা, মৃদু মধুর ঝঙ্কারে প্রাণে সুখের লহরী প্রবাহিত করিয়াছিল; তখন একদিনের জন্যও অনুপমা ভাবে নাই যে, সুখের সহিত দুঃখ সংমিশ্রিত রহিয়াছে; আশার মধ্যেও নিরাশা আধিপত্য করিতেছে; আনন্দের পশ্চাতেও বিষাদ লুকায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছে। আর আজ যৌবনের প্রান্ত সীমায় বসিয়া, নিরাশার সহিত অতীত ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া, উদাস বিহ্বল চিত্তে জীবনের পরিণাম চিন্তা করিতেছে। সহকার বিচ্যুত মাধবীলতার ন্যায় ঘরের মেজেয় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। এক একবার ক্ষুদ্র শিশুর মুখপানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, আর ভাবিতেছে; বাড়ীভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, শিশুটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই; দেনা শোধ করিবার কোন সামর্থ নাই, কি খাইয়া জীবনধারণ করিবে এরূপ কোন উপায় নাই। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই যেন একটা ব্যাকুলতায় তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে ক্রন্দনে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের দুই একটী প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

যখন তাহারা জানিতে পারিল অনুপমার হৃদয়ের ধন, তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহারা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইল। দুঃখ করিয়া আর কি হইবে, শরীর নষ্ট বৈ আর কোন লাভ নাই, এজন্য চিন্তা করিও না, শীঘ্রই অপর কেহ আসিয়া এস্থান অধিকার করিবে। তখন তোমার অভাবজনিত হা-হুতাশও ঘুচিয়া যাইবে। দেখিবে, কত মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। অধৈর্য্য হইও না, বৃথা শোক পরিত্যাগ কর।

এ উপদেশে অনুপমার হৃদয় স্থির হইল না। যখন তাহার মনে

উদয় হইল, অক্ষিযুগলে অঞ্জন লেপন করিয়া অধরে, কপোলে অলক্ত-রাগ রঞ্জিত করিয়া, জীর্ণ যৌবনকে কৃত্রিম আভরণে বিভূষিত করিয়া, হাস্যমুখে ধৈর্য্য সহকারে নূতন নূতন হৃদয় হরণ করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিতে হইবে, তখন তাহার হৃদয়ে এক অসহ্য যন্ত্রণার শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। অদৃষ্টকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়া অনুপমা মরণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎগ্রীব চিত্তে কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৬)

দিন কাটিল ;—সময় কাহারও প্রতীক্ষা করে না। আপন মনে আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া চলিয়া যায়, তুমি সুখে থাক, বা দুঃখে থাক, তাহাতে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? সে দিকে একবারও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। এইরূপ ভাবে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আজও সময় অনুপমার ব্যথায় ব্যথিত না হইয়া, তাহার ক্রন্দনে সহানুভূতি প্রদান না করিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে দিনমণি অস্তাচলগামী হইলেন, সন্ধ্যা হইল, প্রকৃতি দেবী উগ্র-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, স্থির ও গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন, সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইয়া, প্রাণীগণকে আনন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিল, কিন্তু বিষাদ বেদনা ক্লিষ্টা অনুপমার হৃদয়ের কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

অনুপমা সারাদিন অনাহারে, মৃত্তিকায় শয়নে, উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস পতনে, অতিবাহিত করিয়াছে, এখন তাহার হৃদয় পাষাণবৎ নিশ্চল ও স্থির ; প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ স্থির, গম্ভীর ও সাম্যভাব অবলম্বন করে, অনুপমা এখন সেরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছে।

যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য শোক বিসর্জ্জন দিয়া, অতৃপ্ত আশার কামনা অন্তর হইতে দূর করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, যাহারা ভাল বাসিয়াছে, তাহাদের চরিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, বিষাদিত কলঙ্কিত অনুতপ্ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প।

অকস্মাৎ অনুপমা মৃত্তিকায় পতিত শিশুটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। বালকের সুকুমার দেহ দৃঢ়রূপে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় বিদ্যুৎবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। অনতিদূরবর্ত্তী এক সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, শুক্লা সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রদ্যুতি স্থানে স্থানে নিপতিত হইয়াছে, শুভ্রাংশু কর মাথাইয়া পুকুরের জলরাশি ঈষৎ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। অনুপমা অনেক ভাবিল, অবশেষে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঘাটের অপর পারে সুরবালা নাম্নী এক প্রতিবেশিনী কাপড় কাচিতেছিল, তাহার চীৎকারে অনেক লোক জড় হইল, অনুপমা ও শিশুটীকে তুলিতে বিলম্ব ঘটিল না। জল হইতে তুলিয়া দেখা গেল বালক মৃত, অনুপমা সংজ্ঞাহীন।

অচিরে অনুপমাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইল। তথায় সে আরোগ্যলাভ করিল, আত্মহত্যা ও শিশুহত্যা অপরাধে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন। দীর্ঘকাল অনুপমাকে কারাবাসের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। দুই মাস পরে দেখা গেল, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। একদিন সে মস্তকে ইষ্টকের আঘাত করে, সেই আঘাতে কলঙ্কিনীর কলঙ্কপূর্ণ পাপ-জীবন-অঙ্কের যবনিকা পতন ঘটে।

গৃহদাহ

[সমাজ চিত্র]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র একখানি গ্রামের একপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের চারিপার্শ্বে তাল, নারিকেল, অশ্বথ, বটাদি বৃক্ষ সমূহ মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুটীরের পদতল ধৌত করিয়া একটী কলকলনাদিনী ক্ষুদ্র প্রবাহিনী নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল।

অপর পারে বৃক্ষ সমূহের মস্তক স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। মুক্ত গাভী গুলা নদীর তটে বিচরণ করিতেছে। কুটীর খানিতে একঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না—এক ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া তিনি এই কুটীরে বাস করিতেন। দরিদ্রের কুটীর হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহের কোথাও ময়লা জমিলেই গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেন। গৃহিণীর যত্নে কুটীর খানি সর্ব্বদা তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তথাপি ঘরের মধ্যে একখানি শয়ন-গৃহরূপে ও একখানি রন্ধন-গৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। অপর খানিতে লোক জন বসেন, অতিথী সজ্জন আসিলে বাস করেন। কুটীরের পশ্চাতে খানিকটা ক্ষুদ্র জমি। তাহাতে সময়োপযোগী বেগুন, কুমড়া, শাক শবজি প্রভৃতি জন্মাইত। ব্রাহ্মণের নাম সুরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ দম্পতী দরিদ্র হইলেও বেশ সুখে আছেন। তাঁহারা আপনাদের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই কুটীরের দাওয়ায় একখানি পিঁড়ীতে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া ক্রোড়ে একটী ৩।৪ বৎসর বয়স্ক শিশুসন্তান লইয়া একজন যুবক বসিয়া আছেন। শিশু সন্তানটী যুবকের কণিষ্ঠ পুত্র। যুবক বসিয়া বসিয়া সন্তানকে দোলাইতেছিলেন, কখন বা তাহাকে আপনার জানুপরি স্থাপন করিয়া জানু আন্দোলন পূর্ব্বক ও মুখে হোট হোট শব্দ উচ্চারণ করিয়া অশ্বারোহী পদাতিক শব্দ করিতেছেন।

পিতা পুত্রকে লইয়া এইরূপ কৌতুক করিতেছেন, এমন সময় অদূরে দুইজন লোককে তাঁহার কুটীরাভিমুখে আগমন করিতে দেখা গেল।

অনতিবিলম্বে তাহারা তাঁহার কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "মহাশয়, আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি—যদি অনুগ্রহ করিয়া আজকার রাত্রের মত একটু স্থান দেন——"

শুনিয়া যুবক বলিলেন, "আপনারা ?"

তাহারা উত্তর করিল, "আমরা ব্রাহ্মণ—আপনারা" ?

যুবক কহিল,—"আমরাও ব্রাহ্মণ—প্রণাম।"

আগন্তুকদ্বয় কহিল,—"প্রণাম।"

যুবক। "আপনাদের বিপদটা কি ?"

১ম-আ। আমরা এখানে রেশম বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। পথে দস্যুর হস্তে পড়িয়া সমস্ত গিয়াছে। সঙ্গের লোকেরা যে যে দিকে পারিয়াছে পলাইয়াছে—আমরা এই গ্রামে পলাইয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যাও আসন্ন—আমরা বিদেশী লোক, এখানকার পথ ঘাট জানি না—কোথায় থাকি। এখন মহাশয় যদি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।

যুবক কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তার আর কি ? আপনাদের পদধূলিতে এ দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীর পবিত্র হইল। উভয়ে উঠিয়া আসুন—

আমি মুখ হাত ধুইবার জল আনিয়া দিতেছি—এ দরিদ্রের যেরূপ ক্ষমতা তদনুসারে আপনাদের সেবা করিবে।"

যুবক বাটীর মধ্য হইতে এক ঘটি জল আনিয়া দিয়া পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক ভিতরে চলিয়া যাইবার পর—আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল, "কেমন যদু! এই বারতো?"

যদু। হাঁ।

অপর। আচ্ছা যদি লোকটা ব'লত যে এখানে যায়গা হবে না, তখন কি করতিস্?

যদু। আরে—এ লোকটা কখন অতিথিকে বিমুখ করে না। না জেনে কি এ রকম ভেক্ নিয়েছি? লোকটার মন বড় ভাল—গরীব হ'লে কি হয়? আচ্ছা গোবর্দ্ধন, কাজ শেষ কর্তে পারলে জমীদার মশাই কত টাকা দেবেন?

গোবর্দ্ধন। দেড় হাজার টাকা দেবেন বলেছেন। ছুঁড়ীটা বড় সুন্দরী না?

যদু। হাঁ—এই নাক্—এই চোক—ভ্রু—যেন পরী।

গোব। সত্যিনাকি? জমীদার মশাইয়ের কপাল ভাল।

ইহারা আপনাদের কথা কহিতে থাকুক—সেই অবসরে পাঠক! আসুন আমরা একবার সুরেন্দ্রকুমারের বাটীর ভিতরটা দেখিয়া আসি।

সুরেন্দ্রকুমার বাটীর ভিতরে গিয়া ডাকিলেন, "বিরাজ—একবার এদিকে এসতো?"

স্বামীর আহ্বানে বিরজাসুন্দরী সহাস্যমুখে রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বিরজার বয়স ১৮।১৯ হইবে। বিরজা বড় সুন্দরী।

সেরূপে কমনীয়তা আছে—কিন্তু প্রখরতা নাই। সে চক্ষু আয়ত—উজ্জ্বল কিন্তু বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ তাহাতে নাই। বিরজার গুণের সীমা নাই। পাড়ার সকলের বিপদে আপদে বিরজা সাহায্যকারিণী। তথন বিরজা জাতি অজাতি বিচার করিতেন না। বিরজাকে না ভালবাসে এমন লোক পাড়ায় বিরল। বিরজা রূপে গুণে—লক্ষ্মীস্বরূপা। এহেন স্ত্রী পাইয়া সুরেন্দ্রকুমার যে সুখী তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

বিরজা আসিয়া বলিল, "এ অধিনীকে ডাক পড়লো কেন? কোন অতিথি এসেছেন বুঝি?"

সুরেন্দ্রকুমার বলিলেন, "হাঁ, দুজন ব্রাহ্মণ অতিথি এসেছেন। ডাকাতের হাতে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। আজ রাত্রি আমাদের বাড়ীতেই অতিবাহিত করিবেন। তাঁহাদের আহারের আয়োজন চাই। দেখো—যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

বিরজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন? আহা তাঁদের না জানি কত কষ্টই হয়েছে। যাই—যোগাড় যন্ত্র করিগে।"

বিরজা চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রকুমার তাঁহার অতিথিদের কিছু জলযোগ করাইয়া বলিলেন, "মহাশয়েরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি এখনই দোকান হইতে আসিতেছি।" সুরেন্দ্রকুমার কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

তখন সন্ধ্যাকাল। আকাশে বড় মেঘ হইয়াছে। বোধ হয় এখনই বৃষ্টি হইবে।

সুরেন্দ্রকুমার সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গ্রামাভিমুখে ছুটিলেন।

যদু বলিল, "এই সময়। এমন অবসর আর হবে না।"

উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিল। একজন একটী সঙ্কেতধ্বনি করিল। তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বাঁশঝাড়ের অন্তরাল হইতে একখানি শিবিকা ও ছয়জন লাঠিয়াল কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদু ও গোবর্দ্ধন উভয়ে একত্রে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

গৃহিণী বিরজাসুন্দরী তখন নিশ্চিন্তচিত্তে অতিথিগণের জন্য অতি যত্নে রন্ধন করিতেছিলেন।

হায়! তখন তিনি জানিতেন না যে, অতিথিগণের প্রতি যত্ন ও উপকারের প্রতিদানে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র তাঁহার বিরুদ্ধে সৃজিত হইতেছে।

অকস্মাৎ লাঠিয়ালেরা আসিয়া বিরাজকে পশ্চাৎ হইতে চাপিয়া ধরিল। একজন অতি শীঘ্র হস্তে বিরজার মুখ বান্ধিয়া ফেলিল। তৎপরে তাহারা বিরজা সুন্দরীকে শূন্যে তুলিয়া কুটীরের বাহির করিয়া সেই শিবিকার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তাঁহার শিশু পুত্র ও কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের করুণ চীৎকারে এ পাপাত্মাদের দয়া হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহারা বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। হায়—সুরেন্দ্র! তুমি এখন কোথায়? আসিয়া দেখ তোমার গৃহ শূন্য করিয়া গৃহলক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর বুকে তখন মেঘ ও সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু ঘনাইয়া আসিল। অনতিবিলম্বে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সুরেন্দ্রকুমার অতিকষ্টে দোকান হইতে আপনার বাটীর দিকে দ্রুতপদে ফিরিলেন।

অতিথি সৎকারের আনন্দ ও সন্তোষ তাঁহার মনে ঝড়বৃষ্টির কষ্টকে স্থান পাইতে দিল না। একটা পেচক তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া তাহার সিক্তপক্ষ আন্দোলন করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

ক্রমে তিনি কুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রসন্নমনে তিনি কুটীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যেখানে অতিথিরা বসিয়াছিল তথায় যাইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অতঃপর চিন্তিতমনে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার কন্যাটী কাঁদিতেছিল—পুত্রটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পিতাকে দেখিয়া কন্যা তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আসিল। পিতার বসন প্রান্ত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা—তারা আমার মাকে ধ'রে নে গেছে।" সুরেন্দ্রকুমার কন্যার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বিরজা বিরজা"। শূন্য গৃহে তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি হইল। তাঁহার কন্যা পুনরায় বলিল, "মা নেই বাবা—নেই! তারা আমার মাকে বেঁধে নিয়ে গেছে।"

সুরেন্দ্রকুমার ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "কারা" ?

কন্যা কহিল, "যারা আজ আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। মা রাঁধছিলেন এমন সময় তারা আমার মাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেল। বাহিরে একখানা পাল্কী ছিল, মাকে তাতে ক'রে নিয়ে চলে গেল। সুরেন্দ্রকুমার মাথায় হাত দিয়া কক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন, "হা ঈশ্বর! এ জগতের প্রতি তোমার করুণা নাই। কে বলে তোমায় করুণাময়? কি দোষে আমাকে এই কঠিন শাস্তি দিলে প্রভো? হায়!

এ জগতে উপকারের প্রতিদান নাই। আমার বিশ্বাসের ফলে তাহারা আমার সহিত এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গেল। যদি যথার্থই ঈশ্বর থাকেন—তাহা হইলে পাপিষ্ঠেরা এই পাপের শাস্তি পাইবেই পাইবে।”

সুরেন্দ্রকুমার উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কান্তীপুরের জমীদার মহাশয়ের অসীম প্রতাপ। তিনি সম্প্রতি পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। জমীদারের নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়। দেবেন্দ্র যুবক। যৌবনের অদম্য লালসায় বশীভূত হইয়া তিনি নানারূপ পাপকার্য্য সমাধান করিতেছেন। পিতার জীবিতাবস্থায় দেবেন্দ্র পিতার ভয়ে বড় একটা কিছু করিতে পারিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি পিতার মৃত্যু হওয়াতে বাঁধ-ভগ্ন নদীর স্রোতের ন্যায় পাপের স্রোতে আপনার গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। মাথার উপরে শাসন করিবার কেহ না থাকায় তাঁহার সেই উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। অনেকগুলি কুসঙ্গী জুটিয়াছিল, তাহারা নিত্য নূতন আমোদ ও তোষামোদের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের মনস্তুষ্টি সাধন করিত। পাপিষ্ঠদের দৌরাত্মে ক্রমে গ্রামের ভদ্রলোকগণের পরিবারবর্গের জাতি কুল থাকা দায় হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে জমীদার মহাশয়ের মৃত্যু কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ একদিবস শুনিলেন তাঁহার এলাকায় একজন প্রজার অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রী আছে। দেবেন্দ্রের বন্ধুগণ পরামর্শ দিল তাহাকে হস্তগত করিতেই হইবে।

প্রলোভনের দাস, লম্পট যুবক আর কি স্থির থাকিতে পারে ? তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সমাধানের নিমিত্ত পুরস্কারের ঘোষণা করিল।

তাহারই ফলে বিরজা আজ বিপদগ্রস্তা !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এদিকে যদু ও গোবর্দ্ধন তাহাদের সহচরগণের সহিত সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিয়া এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে পড়িল। কিছুদুর অগ্রসর হইয়াছে— হঠাৎ পশ্চাতে গোলযোগ শুনিতে পাইল।

পাল্কীর বেহারারা গোলযোগ শুনিয়া ডাকাত আসিতেছে বুঝিয়া যে যে দিকে পারিল প্রস্থান করিল। যদু দেখিল যে, এ সময় বেহারারা পলায়ন করিলে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। এখন শীকার হস্তভ্রষ্ট হইবে। অধিকন্তু তাহাদের পুরস্কার লাভ সুদূর পরাহত হইবে। সেই জন্য সে চীৎকার করিয়া বেহারাদের ডাকিয়া বলিল, "এই বেহারা, বেশী পয়সা পাবি—ফিরে আয়।" তাহারা "বাপুরে শেষডা ডাকুর হাতে পরাণটা খোয়াইব আর কি ?" বলিয়া অদৃশ্য হইল। এ দিকে গোলযোগ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। যদু ও গোবর্দ্ধন সভয়ে দেখিল প্রায় ১৫।১৬ জন লোক লাঠী, মশাল হস্তে মার মার করিয়া তাহাদিকের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। বেগতিক দেখিয়া লাঠিয়ালেরা সেখানে আর অপেক্ষা করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। অকস্মাৎ অদূরে ভীষণশব্দে বজ্রাঘাত হইল। দেবরোষ বজ্রানলরূপে আবির্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ পাপাত্মা যদু ও গোবর্দ্ধনকে ভূমিস্যাৎ করিয়া ফেলিল।

মানবের সাধ্য কি করুণাময় জগদীশ্বরের কার্য্যের গতির নিরূপণ করে। এদিকে সেই লোকজনেরা আসিয়া বিবজাসুন্দরীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া নিজেরাই শিবিকা বহন করিয়া প্রস্থান করিল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রকুমার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াইতে লাগিলেন। সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন—"এদিকে একখানা পাল্কী নিয়ে কোন লোক জনকে যেতে দেখছ"? এইরূপে সম্মুখস্থ এক বিস্তীর্ণ মাঠের উপর উপস্থিত হইলেন। বিপরীত দিক হইতে একজন জেলে মাথায় টোকা স্কন্ধে জাল লইয়া সেই দুর্য্যোগে গ্রামাভিমুখে "কানু বাজায়ে বেণু চল্ না ভাই গোঠে যাই", গাইতে গাইতে ফিরিতেছিল। সে সুরেন্দ্রকুমারকে চিনিত। তাহার কুটীর সেই গ্রামেতেই। তাঁহাকে ঐরূপ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত দেখিয়া জেলে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "দাদাবাবু হয়েছে কি? এই বাদলায় এমন ক'রে কোথায় যাচ্ছেন?"

সুরেন্দ্রকুমার সেখানে দাঁড়াইলেন। পরে ত্রস্তস্বরে বলিলেন, "রাম লস্কর! পাল্কী নিয়ে জনকতক লোককে এ'দিক দিয়ে যেতে দেখেছ?"

জেলে উত্তর করিল—"হাঁ হাঁ দেখেচি বটে। জমীদার বাবুর বাড়ীর পাইকেরা একখানা পাল্কী নিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছেলো। আমি ভাবলাম্ এ ঝড় বৃষ্টির সময় পাল্কী নিয়ে এরা এ মাঠ দিয়ে কোথায় যায়?—দাদাবাবু! কি হয়েছে গো? আপনার কি কোন বিপদ হয়েছে?"

সুরেন্দ্রকুমার অল্প কথায় তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। জেলে বাধা দিয়া বলিল, 'দাদাবাবু! তারা অনেক লোক যে,

একলা পারবেন কেন? তারা হয়তো আপনাকে মেরে ফেলবে। মা ঠাকরুণ আমাদের কত উপকার করেছেন—আর আমরা এতই কি নিমকহারাম যে তাঁহার এই বিপদের সময় আমরা তাঁহার সাহায্য কর্‌বনা। আমরা থাক্‌তে মাঠাকরুণের কোন ভয় নেই—আমি লোকজন এখনই ডেকে আন্‌ছি—মাঠটা খুবই বড়—শীঘ্র তারা পার হতে পার্‌বে না।" জেলে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিরজা গ্রামের গরীব দুঃখীদের বিপদ আপদে সাহায্য করিতেন—জাতি বিচার করিতেন না। এই জেলে সেই উপকৃতদিগের মধ্যে একজন। সে বিরজার বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া—বিরজা কর্ত্তৃক তাহার পূর্ব্ব উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃত সংকল্প হইয়া প্রস্থান করিল।

সুরেন্দ্রকুমার সেখানে চিন্তাব্যকুল হৃদয়ে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন! অনতিবিলম্বেই ১৫।১৬ জন লাঠি দা প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সেই মাঠাভিমুখে দৌড়াইল।

তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা পাঠকগণ অবগত আছেন—ইহাদিগের দ্বারাই বিরজার উদ্ধার হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

পাপিষ্ঠ জমীদার দেবেন্দ্রনাথ আপনার উপযুক্ত সহচরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদের একটী কক্ষে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল। আর কেবলই দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছে, "বড় দেরী হচ্ছে দেখ্‌ছি, হরে আর গোবরা কি পাজী? তারা এখনো এলনা।"

যতই বিলম্ব হইতে লাগিল দেবেন্দ্র ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে অপ্রতিহতচিত্তে গৃহ মধ্যে পদাচারণ করিতে লাগিল। হঠাৎ বাহিরে কাহাদের পদশব্দ শ্রুত হইল।

সকলে সোৎসুকনেত্রে দ্বারসমীপে চাহিয়া রহিল। দ্বার ঠেলিয়া জনকতক লাঠিয়াল সিক্তবস্ত্রে সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দেবেন্দ্রনাথ আনন্দে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "কিরে—কিস্তিমাৎ ?" লাঠিয়ালেরা সভয়ে সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিল।

পাপিষ্ঠের বড় আশায় ছাই পড়িল—সে বিষণ্ণ হইয়া পুনরায় কক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

সকলে মিলিয়া অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিল, একজন পাপিষ্ঠ প্রভুর ক্রোধানলে ইন্ধন সংযোগ করিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে বাদাবাদী—আমাদের দেবেন্দ্র বাবুকে চেনো না বটে। আহা—হরে আর গোবর্দ্ধন এমন সময়ে ম'রে গেল। অমন কাজের লোক কিন্তু আর হবে না"।

অপর এক পাপাত্মা পরামর্শ দিল আরও বেশী লোকজন নিয়ে আবার ছুঁড়িটাকে নিয়ে আসা যাক।"

আর একজন বলিল, "যেমন তাদের জন্য আমাদের হরে ও গোবর্দ্ধন ম'রে গেল—তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। তাহাদের ঘর বাড়ী সব পুড়িয়ে দেওয়া যাক।"

শেষ পরামর্শ পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রের মতানুযায়ী হইল। তৎক্ষণাৎ বন্দোবস্ত স্থির হইল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমি নিজে একবার দেখ্‌ব।"

পাপিষ্ঠেরা বিকট কলরব করিতে করিতে লোকজন সঙ্গে লইয়া, হতভাগ্য, নিরপরাধ সুরেন্দ্রকুমারের কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে সুরেন্দ্রকুমার বিরজাকে উদ্ধার করিয়া কুটীরে ফিরিলেন। কৃতজ্ঞ জেলেরা সকলে আপন্ আবাস কুটীরে ফিরিয়া গেল। সুরেন্দ্রকুমার ও বিরজা কুটীরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের পুত্রকন্যা-দ্বয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সুরেন্দ্রকুমার প্রেমভরে বিরজাকে উভয়বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বিরজা—লোকগুলা তোমাকে কি রকম ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল ?"

বিরজা সুন্দরী উত্তর করিলেন, "আমি বসে রাঁধছি। এমন সময় কাহারা এসে আমার হাত, পা, চোক্ মুখ সববেঁধে ফেল্লে। তারপর, তারা আমাকে একখানা পাল্কীতে তুলে নিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস সময়াসময়ে চাষাভূষা লোকগুলার কিছু উপকার ক'রেছিলে -তা নহিলে কি হ'ত বল দেখি ?"

হায়! বিরজা, তোমার বিপদের অবসান এখন কোথায় ?

পুণ্যজন দম্পতিযুগল এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বাটীর চতুর্দ্দিকে ধু ধু করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা পুত্রকন্যাদ্বয়কে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শশব্যস্তে কুটীর হইতে বাহিরে যাইতে গিয়া দেখেন, গৃহদ্বার বাহির হইতে আবদ্ধ। সুরেন্দ্রকুমার বহুচেষ্টা করিলেন, কিন্তু, কিছুতেই কোনও পথ দিয়া বাহির হইতে পারিলেন না। অবশেষে তাহারা হতাশ হইয়া কক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন।

অগ্নি বাড়িতে লাগিল।

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সুরেন্দ্রকুমার রুদ্ধশ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "করুণাময় জগৎপতি ?—জনকতক নির্দ্দোষ প্রাণীকে তোমার এই

বিশাল জগতের একপ্রান্তে, একটু স্থান দিতে তোমার সৃষ্টির এমন কি অনিবার্য্য বিঘ্ন উপস্থিত হইত প্রভো ?"

অগ্নি আরও বাড়িল—ক্রমে তাহার লোলজিহ্বা নভোমণ্ডলের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

ক্ষুদ্র প্রবাহিনীর অন্ধকারময় জল সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষে সেই ভীষণ অগ্নি প্রতিফলিত হইয়া নাচিতে লাগিল।

ক্রমে কুটীর পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

বাহিরে কাহাদের পৈশাচিক অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

এক নির্দ্দোষ পুণ্যবান্ পরিবার এইরূপে পাপ-তাপ-পূর্ণ এ পৃথিবীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

দিদিমণি

[প্রণয়-কাহিনী]

(১)

রাধারমণ ঘোষ কালিঘাটের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নিজ চরিত্রবলে জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দীনদুঃখীর অভাব বিমোচনে তিনি রিক্তহস্ত ছিলেন, পাড়ার লোকে ঘোষ মহাশয় বলিতে অজ্ঞান হইত। রাধারমণ বাবু গভর্ণমেণ্ট অফিসে উচ্চ বেতনে কার্য্য করিতেন। তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও কার্য্যতৎপরতায় অফিসে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের সুনজরে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নটবর। কন্যাদি কেহই ছিল না। নটবর পিতার যত্নে ও নিজের প্রতিভাবলে বি, এল পাস করিয়া আলিপুরের পুলিশ কোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই;—রাধারমণ বাবু বাল্য-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীর ছেলেরা অল্প বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসার-জালে আবদ্ধ হয়। তাহারা জগতের আর কোন মঙ্গলদায়ককার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পায় না, কেবল সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। নটবর ওকালতি করিয়া উপায়ক্ষম হইলে রাধারমণবাবু ভবানীপুরের রাইচরণ বসুর কন্যা জীবনতারার সহিত নটবরের বিবাহ দেন। রাইচরণ অতিশয় দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বহুদিবস শয্যাশায়ী থাকিয়া কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় দুইটী কন্যা রাখিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পত্নী

ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছিলেন। কন্যা দুইটী তাহাদিগের মাসী-মা'র যত্নে পালিতা হইয়াছিল। এই মাসী-মা'র তিন কুলে কেহ ছিল না, রাইচরণ তাহাকে কন্যা দুইটীর ভার দিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

যখন রাইচরণের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবনতারার বয়স এগার বৎসর ও কনিষ্ঠা নয়নতারার বয়স আট বৎসর। রাইচরণ ব্যাধিপীড়িত অবস্থায় কন্যা দুইটীকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখিলে ভাবনায় অস্থির হইতেন। মনে মনে ভাবিতেন এইবার আরোগ্যলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে কন্যাদ্বয়ের বিবাহের জন্য যেপ্রকারেই হোক্, কিছু অর্থের সংস্থান করিতে হইবে। কিন্তু জীবনে তাঁহার এ আশা ফলবতী হয় নাই, কুটীল কাল অতি শীঘ্র তাঁহার জীবন-আয়ু অপহৃত করিয়াছিল।

জীবন ও নয়নতারা পিতৃহীনা হইলে তাহাদিগের মাসী-মা রাইচরণের সঞ্চিত সামান্য অর্থে দুই বৎসর কাল কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করিল। এক্ষণে জীবনতারার বয়স তের বৎসর, তাহার আর বিবাহ না দিলে চলে না, যৌবনের রূপলাবণ্য রাশি তাহার প্রত্যঙ্গে বিকসিত হইয়াছে। পাড়ার লোকে কাণাকানি করিতে লাগিল—এত বড় মেয়ে—বিয়ে দিবার নাম নাই। মাসী-মা অসীম চিন্তাসাগরে নিমগ্না—কি করিবে, কাহার সাহায্য লইবে? অবশেষে সে পাঁচজনের পরামর্শে মহানুভব রাধারমণ বাবুর স্ত্রীর নিকটে নিজের কষ্টের কথা কহিল,—তিনি মাসী-মার কথা অবগত হইয়া স্বামীকে সাহায্য দানের জন্য অনুরোধ করিলেন। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী; উভয়েরই হৃদয় পরের দুঃখে দ্রব হইত। রাধারমণ বাবু মাসী-মা'র সহিত তাহার বাটীতে গিয়া তাহাদিগের অবস্থাদির বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিজপুত্র নটবরের সহিত জীবনতারার বিবাহ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় বরকর্ত্তারা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অথবা অন্য অভিভাবক-দিগের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই পুত্রের বিবাহের কথা

ধার্য্য করেন। কয়জন রাধারমণ ঘোষের ন্যায় পরদুঃখে কাতর হইয়া নটবরের মত উচ্চশিক্ষিত, উপায়ক্ষম পুত্রের বিবাহ দরিদ্র বালিকার সহিত দিয়া থাকেন? যাহা হোক্, কীর্ত্তিমান্ রাধারমণ এই কার্য্যে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সংবাদ-পত্রে এই ঘটনা লইয়া কিছুদিন বেশ আন্দোলন চলিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আর কেহ কোন কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকের এইরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি।

জীবনতারা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বীয় চরিত্রগুণে অতি শীঘ্রই শ্বশুর ও শাশুড়ীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। নটবর আদালতে ওকালতি করিয়া মস্তিষ্ক পরিচালনায় যে কষ্ট অনুভব করিতেন, উপযুক্ত পত্নীরপাশে সেবা ও শুশ্রূষা পাইয়া তাহা উপশম হইত। জীবনতারার বিবাহের পর দুই বৎসর বেশ আনন্দে কাটিল। তারপর সহসা একদিন কলেরা রোগে রাধারমণ বাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তাঁহার পত্নী পতি-শোকে কাতর হইয়া পনের দিবসের পর সান্নিপাতিক জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিতা হ'ন। নটবর পিতৃ-মাতৃহারা হইয়া বড়ই কষ্টে পড়িলেন। এক মাস কাল আদালত যাওয়া বন্ধ করিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সংসারে অপর আত্মীয়স্বজন কেহ ছিল না, জীবনতারাকেই সংসারের সকল কাজকর্ম্ম করিতে হইত। সময়ে সময়ে তাহার মাসী-মা আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিত, কনিষ্ঠা ভগ্নী নয়নতারা মাসী-মা'র সহিত যাওয়া আসা করিত, কখন কখনওবা দিদিমণির কাছে থাকিত।

(২)

নয়নতারার বয়স প্রায় তের বৎসর অতিক্রম করিতে চলিল, তথাপি তাহার বিবাহের কোন কথা নাই।—একদিন নটবর আদালতে গমন করিলে পর মাসী-মা নয়নতারার বিবাহ দিবার জন্য জীবনতারাকে

নটবরের নিকট প্রস্তাব করিতে বলিল ; জীবনতারা অতিশয় বুদ্ধিমতী। সে স্বামীর মন যোগাইয়া, তাঁহার অভাব দূরীকরণে সততই তৎপর থাকিত। এজন্য নটবর তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

আজ পূর্ণিমা যামিনী, শশধর পূর্ণ কলেবরে অনন্ত অম্বরে পরিদৃশ্যমান। ফাল্গুণের মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, এমন সময়ে নটবর শয়নকক্ষে শায়িত ; পার্শ্বে যুবতী পত্নী গভীর নিদ্রায় অভিভূতা। নটবর সেই জ্যোৎস্নালোকে জীবনতারার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কতবার তিনি তাহাকে দেখিয়াছেন, কতবার তাহাকে সপ্রেম সম্ভাষণ করিয়াছেন, তথাপি আজ যেন তাঁহার হৃদয় এক অতৃপ্ত কামনায় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি একবার নক্ষত্রখচিত গগনে পূর্ণচন্দ্রের সহিত স্বীয় পত্নীর প্রফুল্ল পদ্মাননের তুলনা করিলেন,—করিয়া সানন্দে জীবনতারার মুখচুম্বন করিলেন। জীবনতারার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে নটবরকে প্রফুল্লিত দেখিয়া নানা কথার পর নয়নতারার বিবাহের কথা পাড়িল। শুনিয়া নটবর নয়নতারার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না ; পিতার অতুল ধন—তিনিও নিজে উপায়ক্ষম। দিদিমণির অনুকম্পায় আজ নয়নতারার একটা কুল পাইবার আশা হইল।

যেমন প্রস্তাব অমনি কার্য্যারম্ভ, পরদিন হইতেই নটবর পাড়ায় পাড়ায় লোক পাঠাইয়া পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীনা দুঃখিনী নয়নতারার ভাগ্যে ভাল বর জুটিল না। মানুষ মাত্রেই স্বার্থের দাস, নিস্বার্থভাবে পরোপকার সাধন কয়জন এজগতে করিয়া থাকেন ? মাসী-মা যাহার কাছে গিয়া নয়নতারার বিবাহের কথা উত্থাপন করে, সেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। কেহ বলে, "মেয়ের বাপ-মা নাই, পাওনা থোওনা নাই, ও মেয়ের সঙ্গে বেটার বিয়ে দিয়ে আর কি সাধ আহ্লাদ হবে" ; কেহ বলে, "ভগ্নীপতি মুরুব্বি,—তা—তাকে তিন হাজার টাকা দিতে বল—আমার ছেলের সঙ্গে না হয় নয়নতারার বিয়ে দি।"

নটবর এই সকল কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন না হয় কিছু বেশি অর্থব্যয় করিয়া নয়নতারার ভাল ঘরে বিবাহ দিবেন, কিন্তু তাহাতে বড় সুবিধা হইল না।—যে সকল পাত্রের অভিভাবক অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইল, তাহাদের মধ্যে কোন পাত্র চরিত্র দোষে কলঙ্কিত, কেহ মূর্খ, কেহ বা কপর্দ্দক শূন্য। এইরূপে পাত্র খুঁজিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল, নয়নতারা চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিল; সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালীর মেয়ে যে এই বয়সে পুত্রবতী হইয়া ঘোর সংসার বন্ধনে জড়ীভূতা হইয়া থাকে। নটবর আর কাল বিলম্ব না করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রামের রামকান্তের করে দুই হাজার টাকা প্রদান করিয়া নয়নতারার বিবাহ দিলেন।

রামকান্ত ইতিপূর্ব্বে একবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতা কেহই নাই, সংসারে এক পত্নী বর্ত্তমান, তাহার গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তাহাকে বন্ধ্যাজ্ঞানে রামকান্ত পুত্র কামনায় নয়নতারাকে পুনঃরায় বিবাহ করিলেন। রামকান্তের স্বভাবচরিত্র ভালছিল, তিনি কলিকাতার কোনও সওদাগরি অফিসে পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনে কেরাণির কর্ম্ম করিতেন, নটবর এই অফিসের নিযুক্ত উকিল ছিলেন, সেই সূত্রে রামকান্তের সহিত তাঁহার আলাপ হয়, আলাপে নয়নতারার বিবাহ। কে জানে নয়নতারা এ বিবাহে সুখী কিনা, তবে দিদিমণির প্রসাদে সে আর অবিবাহিতা নহে।

(৩)

বিবাহের পর এক বৎসর বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল, নয়নতারা সতীনের মন জগাইয়া, স্বামীর পদ সেবা করিয়া, সংসারের সকল কার্য্য নিজে সমাপন করিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল, রামকান্ত পুত্রের মুখ দেখিবার আশায় ডেলিপেসেঞ্জার হইয়া বাড়ী হইতে অফিসে প্রত্যহই

যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে নয়নতারার সহিত তাঁহার আলাপ দিনদিন বেশ ঘনিভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীনের এতটা ভাল লাগিল না, সে নয়নতারার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল এবং রামকান্তকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার অফিসে যাইবার নির্দ্ধারিত সময়ে, ইচ্ছা করিয়া প্রতিদিন এক একটা নূতন প্রতিবন্ধক আনিয়া ফেলিত। ফলে রামকান্তের অনিয়মে অফিসে যাতায়াতে সাহেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জবাব দিলেন। চাকুরী গতপ্রাণ বাঙ্গালীর ছেলের চাকুরী গেলে যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

রামকান্ত চাকুরী হারাইয়া দুই চারিমাস ঘরে বসিয়া সঞ্চিত অর্থের ধ্বংস করিলেন। গৃহে সতীনে সতীনে ক্রমশঃই বাদ বিসম্বাদ ঘটিতে লাগিল, কেননা রামকান্ত একটু অধিকক্ষণ নয়নতারার কাছে থাকেন, তাহাকে একটু বেশী ভালবাসেন। সতীন কি ইহা দেখিতে পারে? কাজেই রামকান্তের প্রথমা পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। তাহার পিতার অবস্থা বড় মন্দ নয়, সে তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিতে লাগিল। নয়নতারা স্বামীর এই দুর্দ্দিনে তাঁহার হতাশ প্রাণে নানারূপ সুখের কমনীয় ছবি আঁকিয়া স্বামীর পদ সেবায় সতত ব্যস্ত থাকিত। নয়নতারার এক দিদিমণি ব্যতীত আর কোন অভি-ভাবিকা ছিল না। মাসী-মা'র মৃত্যু হইয়াছে, এ অবস্থায় সে রামকান্তকে কাছে থাকিতে দেখিলে প্রাণে এক মহাবল অনুভব করিত; বিশেষতঃ সে বুঝিয়াছিল যে, রমণীর স্বামী ভিন্ন গতি নাই। যে স্ত্রী স্বামীর দুর্দ্দিনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে সুখের হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া কালক্ষয় করে, সে "স্ত্রী" নামের অনপযুক্ত। রামকান্ত প্রথমা পত্নীকে কাছে না দেখিয়া তাহার উপর ক্রমশঃই বিরক্ত হইতে লাগিল, আর নয়নতারা সেই রামকান্তের হৃদয়াসনে ক্রমে ক্রমে স্থানাধিকার করিয়া বসিল। রামকান্তের প্রথমা পত্নী ভাবিয়াছিল যে, সে স্বামীর গৃহ হইতে

পিতৃভবনে গমন করিলে রামকান্ত বাধ্য হইয়া তাহাকে তুষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া আবার আপন ভবনে আনিবেন, কিন্তু তাহার এ আশা পূর্ণ হয় নাই। রামকান্ত তাহার অদর্শনে দিন দিন তাহার স্মৃতি হৃদয় হইতে দূর করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বামী স্ত্রীতে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, ইহজীবনে আর উহাদিগের মিলন হয় নাই।

রামকান্ত চাকুরী হারাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে একবৎসর কাল নয়নতারার অলঙ্কার ও পৈত্রিক বাটী বিক্রয় করিয়া অপরের বাড়ীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া দিন কাটাইয়াছিলেন, তার পর তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া কিছুকাল গেল—তবুও চাকুরী জুটিল না, নানা দুশ্চিন্তায় রামকান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন, শেষ কাশরোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার দিন চলা দায়। হায় রামকান্ত! চাকুরীই তোমার স্বাস্থ্য, সহায়, উৎসাহ ছিল, তুমি চাকুরী হারাইয়াই আজ সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে বসিয়াছ। নয়নতারা কষ্টে পড়িয়া দিদিমণির শরণ লইল—জীবনতারা ভগিনীর দুর্দ্দশায় ম্রিয়মাণ হইয়া নটবরের নিকট হইতে পনের টাকা করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া দিত। নয়নতারা তাহাতেই কায়ক্লেশে একবেলা খাইয়া, বাড়ী ভাড়া দিয়া স্বামীর শুশ্রূষায় ও সুচিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিত। তাহার সতীন এ সকল খবর পাইয়াও স্বামীর কাছে আসিত না, রামকান্ত তাহার নামে জ্বলিয়া উঠিতেন।

নয়নতারা প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াও রামকান্তের রোগের উপশম করিতে পারিল না। ব্যাধি ক্রমশঃই দুরারোগ্য হইয়া উঠিল। দিন রাত্রি কাটান নয়নতারার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল; অবস্থা বুঝিয়া নয়নতারা দিদিমণি ও সতীনকে সংবাদ দিল। সতীন সে সংবাদে কিছু মাত্র দুঃখিতা না হইয়া অধিকতর কোপান্বিতা হইল; ভাবিল "জীবনে যে আমায় ভালরূপ যত্ন না করিয়াছে, তাহার মরণে আমার কষ্ট কি? "সে একবার বুঝিল না যে, সে নিজে আপন

পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছিল, সে যদি বুদ্ধিমতী ও পতিগতপ্রাণা হইত, তাহা হইলে কখনও পতির উপর রাগ করিয়া পিত্রালয়ে যাইত না। পাঠিকাঠাকুরাণি! যদি কখনও গ্রহ বশে আপনার প্রাণপ্রিয় পতির সহিত মনোমালিন্য হয়, তাহা হইলে যেন কখনও সতীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন না।

জীবনতারা কনিষ্ঠা ভগিনীর বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া নটবরকে রামকান্তের বাটীতে পাঠাইয়া দিল। নটবর রামকান্তকে বন্ধুভাবে যত্ন করিতেন। তাঁহার চিকিৎসা বিধানের জন্য নয়নতারা যখন যাহা চাহিয়াছিল, তিনি তাহা প্রদানে কখনও কৃপণতা করেন নাই। আজ রামকান্তের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া নটবর প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। রামকান্ত নটবরকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বাকরোধ হইয়াছিল। তিনি কপালে করাঘাত করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, তারপর মহানিদ্রার আশ্রয় লইলেন। নয়নতারার যাহা গর্ব্বের, যাহা স্পর্দ্ধার, যাহা ইহজীবনের একমাত্র সম্বল, যাঁহার সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়াবলম্বনে সে তাপদগ্ধ প্রাণে আনন্দ অনুভব করিত, তিনি আজ তাহাকে অকূল পাথারে ফেলিয়া কোন্ অজানিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

নটবর যাহা এত শীঘ্র দেখিবে বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রামকান্তের মৃত্যুতে তিনি কি করিবেন তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না; পাড়া প্রতিবাসিদিগের পরামর্শ লইয়া নটবর নয়নতারার সতীনের পিত্রালয়ে গিয়া রামকান্তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সতীনের পিতা তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া দু'কথা বেশ শুনাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর নটবর তথা হইতে ফিরিয়া পাড়া প্রতিবাসিদিগের সহায়তায় রামকান্তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন।

নটবর যথোচিত অর্থ ব্যয় করিয়া ও নয়নতারার রক্ষণাবেক্ষণের

ব্যবস্থা করিয়া স্বীয় ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জীবনতারা ভগিনীর ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল।

(৪)

অতিকষ্টে নয়নতারা একমাস কাল অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিল। নটবর রামকান্তের শ্রাদ্ধাদির খরচ যোগাইয়া নয়নতারাকে শুদ্ধ করাইয়া ছিলেন। নয়নতারার সতীন ইহার মধ্যে আসিয়া একবার নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। আশা ছিল—স্বামীর সম্পত্তির ভাগ লইবে, কিন্তু তাঁহার দেনার কথা শুনিয়া সতীন আর নয়নতারার সহিত দেখা করে নাই, তবে রামকান্তের শ্রাদ্ধের সময় সে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রামকান্তের জন্য দু'এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছিল। অশৌচান্তে জীবনতারা ভগ্নীকে লইয়া আসিবার জন্য নটবর সমীপে আব্দার করিয়া বসিল।

নটবর প্রথমে নয়নতারাকে স্বীয় বাটীতে রাখিবার জন্য অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু জীবনতারা হটিবার পাত্রী নহে; নানারূপ যুক্তিপূর্ণ কথায় নটবরকে বুঝাইয়া ভগ্নীকে নিজের কাছে রাখাই স্থির করিল। জীবনতারার একটি পুত্র হইয়াছিল। সে বলিল,—"আমার বোনের জন্য তোমার খরচ বাড়িবে না, আমি দাসীকে ছাড়াইয়া দিব, খোকার ভার নয়নতারার উপর থাকিবে, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিবে।"

অগত্যা নটবর নয়নতারাকে শ্বশুরালয় হইতে স্বীয় ভবনে আনিয়া রাখিলেন। দুই ভগ্নীতে সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। নটবরের এখন বেশ আয় হইয়াছে, তিনি জীবনতারাকে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা রাখিতেন। জীবনতারা নিজের পরিধেয় বসন ও গাত্রাভরণে নয়নতারাকে সাজাইয়া রাখিত; বিধবা বলিয়া স্বতন্ত্র সাজে তাহাকে সজ্জিতা করে নাই। তাহার বয়স অল্প, সবে মাত্র ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে,

যৌবনের সৌন্দর্য্যরাশি তাহার প্রত্যঙ্গে বিকসিত। এ অবস্থায় জীবনতারা তাহাকে বসন-ভূষণ পরিবার সুখে বঞ্চিতা করে নাই, তবে নয়নতারা স্বেচ্ছায় কখনও কখনও সাদা থান কাপড় পরিত।

নটবরের বাটীর পার্শ্বেই এক পুষ্করিণী ছিল। নয়নতারা কাজকর্ম্ম সারিয়া একটু সময় পাইলেই এই সরসীতটে আসিয়া বসিত। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। বেলা ছয়টা বাজিয়াছে, অনন্ত অম্বরের পশ্চিম দিকে অস্তাচলগামী ভাস্করদেব ক্ষীণতর মূর্ত্তিতে ঢলিয়া পড়িতেছেন, পূর্ব্বাকাশে নিশানাথের উদয় হইতেছে। এমন সময়ে নয়নতারা সরসীবক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল,—"স্ত্রীলোক কোন্ কর্ম্মফলে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে? পূর্ব্বজন্মে আমি এমন কি দুষ্কার্য্য করিয়াছি, যাহার প্রতিফল স্বরূপ আমি এই নবীন বয়সে জীবনের সুখ-সাধ জলাঞ্জলি দিয়া দিদিমণির সংসারে আসিয়া বসবাস করিতেছি। আমার ত সবই ছিল, কোন্ পাপে আমি সে সকল সুখে বঞ্চিতা হইল্যম?"

নয়নতারা যখন সেই নির্জ্জন সরসীতটে বসিয়া নিজের অবস্থা সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতেছিল, এমন সময় নটবর আদালত হইতে আসিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়নতারা আপন মনে ভাবিতেছিল, সে নটবরকে লক্ষ্য করে নাই। নটবর নয়নতারাকে সেইরূপে অবস্থিতা দেখিয়া, আজ তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি নয়নতারাকে ইতিপূর্ব্বে পবিত্রভাবে অনেকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু সে যে এতদূর রূপবতী তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। আজ নটবর নয়নতারাকে নির্জ্জনে উপবিষ্টা দেখিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার রূপমাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এইরূপ দেখিতে দেখিতে নয়নতারার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, সে অপ্রতিভ হইয়া সেই স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল, আর নটবর তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন,—জীবন



স্ত্রীলোক কোন কর্ম্মফলে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে ?

[দিদিমণি—১০ পৃষ্ঠা ।

ও নয়নতারার মধ্যে কে অধিক সুন্দরী? তারপর মুখ হাত ধুইয়া চলিয়া গেলেন।

নয়নতারা গৃহে গিয়া দিদিমণির কোল হইতে খোকাকে স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইল।

(৫)

কে জানে সৌন্দর্য্যের কি বিশ্ববিমোহিনী শক্তি! সুকুমারমতি বালক, যে চলিতে, হাঁটিতে বা ভালরূপ কথা কহিতে পারে না, সেও কিশলয় শিরে প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাকে ধরিতে যায়, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের শোভা সন্দর্শনে ক্রন্দন সম্বরণ করে। নটবর নয়নতারার রূপ-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া নিজের বল, বুদ্ধি, বিবেক আজ সমস্তই বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি আশৈশব নয়নতারাকে পবিত্র চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যার সময়, সেই সরসীতটে, একাকিনী অবস্থায় পাপপূরিত-নয়নে একবার নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়সাগরের বাসনা তরঙ্গের অবিরাম আলোড়নে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি জীবনতারার আত্মত্যাগ, অতুল্য সেবা শুশ্রূষা ভুলিয়া, নিজের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া, নয়নতারার চিত্তাকর্ষণে মনঃসংযোগ করিলেন। নয়নতারার চিত্ত পবিত্র, নির্ম্মল, সে দিদিমণির সুখে সুখী; দিদিমণির যাহাতে কষ্টের লাঘব হয় সেজন্য সে প্রাণদানেও কাতরা নহে। সে জীবনতারার পরিশ্রম লাঘব-মানসে নটবরকে সময়ে সময়ে ভাত, জলখাবার, পান প্রভৃতি দিয়া আসিত। নটবর কলুষিত নয়নে তাহার প্রতি আকুল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতেন। নয়নতারার দৃষ্টি কখনও ঊর্দ্ধগামী ছিল না, সে মাটীর দিকে চাহিয়া নটবরের সহিত কথা কহিত, কিন্তু নটবর যেন তাহার সহিত অধিক কথা কহিলে সুখ অনুভব করেন, নয়নতারার সহিত কোন কথা হইতেছে,

এমন সময় যদি জীবনতারা তথায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে নটবর মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কোন একটা মিছা কাজে পাঠাইয়া দিতেন, নয়নতারা দিদিমণির সহিত চলিয়া যাইত। জীবনতারা নয়নতারাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, সে নিজের পরিধেয় উত্তম বসন তাহাকে পরাইত; এই সুযোগে নটবর দুই ভগ্নীর একই রূপ, বসনভূষণ কিনিয়া আনিতেন। নয়নতারা কিসে সুখী হয়, তাহার জন্য নটবর সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি অনেকবার জীবনতারাকে কর্কশবাক্যে সম্বোধন করিয়া নয়নতারাকে মধুরবচনে আপ্যায়িত করিতেন। জীবনতারা পান সাজিয়া দিলে নটবর তাহাকে অধিক চূণ দেওয়ার ছলে তিরস্কার করিতেন, আবার কখনওবা চূণ কম হওয়ার ছলে তাহার কার্য্যের অশেষ নিন্দা করিতেন; নয়নতারার হস্তের সাজা পান তাহার বড় ভাল লাগিত।

এইরূপে নটবর জীবনতারার অযাচিত প্রেম উপেক্ষা করিয়া, নয়নতারার হৃদয়ের কণামাত্র করুণালাভের প্রত্যাশায় তাহার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য অন্তরে অন্তরে অহরহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যতই তিনি নয়নতারার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই জীবনতারার মূর্ত্তি বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি নয়নতারার ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িলেন, দিন দিন আদালতে অনুপস্থিত হইয়া সামান্য অসুখের অনুযোগে বাড়ীতে থাকিলে নয়নতারার ভাবনায় বিভোর থাকিতেন। আবার কখনওবা আদালতে হাকিমের সন্নিধানে মক্কেলের সাপক্ষে কোন কথা না বলিয়া, চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ বিপক্ষেও দু'এক কথা বলিয়া ফেলিতেন—পরক্ষণে আবার নিজের কার্য্যদক্ষতার গুণে তাহা সামলাইয়া লইতেন। শয়নে, স্বপনে, আদালতে, জাগরণে সর্ব্বদাই নটবর নয়নতারার বিষয় ভাবিতেন। নয়নতারা নটবরের এত যত্ন ভাল বোধ করিত না, সে দিদিমণির মুখ চাহিয়া সাধ্যমত নটবরের নিকট হইতে দূরে থাকিতে ত্রুটী করিত না

নয়নতারা যত নটবরের নিকট হইতে দূরতর স্থানে অবস্থান করিত, নটবর ততই তাহার জন্য আকুল হইতেন, ভাবিতেন জীবনতারাই বুঝি আমার এ সুখের পথে কণ্টক—এ কণ্টক দূর করিব—তবে আমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

(৬)

যেমন কল্পনা, অমনই কার্য্যারম্ভ, ধীরে ধীরে নটবর জীবনতারাকে পর ভাবিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি মনে বেশ সুখ বা শান্তি লাভ না করিলেও নয়নতারাকে পাইবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইচ্ছা জীবনতারাকে এইরূপ অযত্ন করিলে, সে আর তাহার কাছে আসিবে না, নয়নতারাকে পাঠাইবে, আর নয়নতারা একটু বেশী যাতায়াত করিলেই সে সুবিধামত একদিন তাহাকে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু দুই তিন মাস অপেক্ষা করিয়াও নটবর কোনও সুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন না। ইহার মধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুরাপানারম্ভ করিয়াছিলেন; জীবনতারা সহসা তাহার মুখে সুরার সৌরভ পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, স্বামীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাতর হইল, সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, নটবর নয়নতারাকে ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাহাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। নয়নতারাও যে নটবরের মনোভাব বুঝিতে পারে নাই এমন নহে, বুঝিয়াই সে আর বড় একটা নটবরের কাছে যাইত না। আবার না যাইলে নটবর পুনঃপুনঃ তাহাকে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। জীবনতারা নটবর ও নয়নতারাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল, ভাবিল—কুক্ষণেই আমি নয়নতারাকে স্বীয় সন্নিধানে রাখিবার জন্য স্বামীর সমীপে অনুযোগ করিয়াছিলাম, কুক্ষণে নয়নতারা বিধবা হইয়াছিল। জীবনতারা এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও বিচলিতা হয় নাই, স্বামীকে ক্ষণকালের

জন্য অযত্ন বা অভক্তি করে নাই, কেবল তাহার চিত্তবৃত্তিকে সুপথে আনিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল। এক দিন জীবনতারা নয়নতারাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল, নয়নতারা কোন কথা গোপন করিল না। অবশেষে তাহারা যুক্তি করিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিল। জীবনতারা দিনমানে যে বস্ত্র পরিধান করিত, বৈকালে সেই বস্ত্র নয়নতারাকে পরাইত, আর বৈকালে জীবনতারা নয়নতারার কাপড় পরিত। জীবনতারা দিনমানে নথ পরিত আর বৈকালে নিজের নথ খুলিয়া নয়নতারাকে পরাইয়া দিত। নয়নতারা বিধবা হইয়া অবধি নটবরকে দেখিলে ঈষৎ ঘোমঠা দিয়া কথা কহিত, জীবনতারা সেইরূপ ভাবে সন্ধ্যার পর দু' একবার নটবরের গৃহে যাইলে একদিন নটবর জীবনতারাকে (নয়নতারা জ্ঞানে) মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। সেদিন তিনি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়াছিলেন, বহুপূর্ব্ব হইতেই নটবর জীবনতারার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। আজ এই সুযোগে জীবনতারা নয়নতারার গলার স্বরে কহিল, "ছি! একি কথা।"

নটবর কহিলেন, "নয়নতারা তুমি আমার হও, নৈলে আমি মরব।"

জীবনতারা (নয়নতারা সাজিয়া) কহিল, "যাও যাও, দিদিমণি শুন্‌তে পাবে, আমার দিকে অমন করে চেয়ে থাক কেন? দিদিমণি জান্‌তে পার্‌লে কি ভাব্‌বে বল দেখি!"

নটবর কহিলেন, কিছু না, এস আমার কাছে এস।"

জীবনতারা (নয়নতারার স্বরে) কহিল, "না এখন না।"

ইহা শুনিয়া নটবর কহিলেন, "তবে কাল রাত্রিতে আমার বৈঠকখানায় এস, একটু বেশী রাত্রে এস, আমি সেইখানে তোমার জন্য থাক্‌ব, জীবনতারা এ বিষয়ে কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না।"

জীবনতারা (নয়নতারা স্বরে) "আচ্ছা" বলিয়া সবেগে প্রস্থান

করিল, তারপর নয়নতারার কাছে গিয়া নিজের নথ ও কাপড় পরিল, নয়নতারা আপন পরিধেয় বস্ত্র দিদিমণির নিকট হইতে লইল।

(৭)

অতি কষ্টে আজ নটবর রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি নিত্য কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক যথাকালে আহারাদি করিয়া আদালতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু আজ তাঁহার সে স্থান ভাল লাগিল না, যে মক্কেলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি সে দিন হাকিমের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার অদৃষ্ট দোষে নটবর আজ হারিয়া গেলেন। তাঁহার অপেক্ষা এক জন ছোট উকিল কুটতর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নটবর ক্ষোভে রোষে আদালত পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; প্রত্যহ যে ভাবে নটবর বাড়ীতে আসিতেন, আজ সে ভাবে আসেন নাই। আজি তাঁহার হৃদয়ে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় সুরা পান করিয়া প্রীতি পূর্ণ চিত্তে হেলিতে দুলিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন। জীবনতারা সন্ধ্যার পর প্রথমে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ও নথ পরিয়া নটবরকে আহারীয় সামগ্রী দিয়া আসিল, নটবর আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হুকা সুন্দরীর সেবা করিয়া রাত্রিতে নয়নতারাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। অতঃপর জীবনতারা নয়নতারার বেশ ধারণ করিয়া, খোকাকে কোলে লইয়া, মাথায় একটু বেশী ঘোমটা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিয়া নটবর কহিলেন, "নয়নতারা! কাল যা' বলেছি বোধ হয় তোমার মনে আছে! আজ বৈঠকখানায় রাত্রি ১০টার পর যাবে ত?"

জীবনতারা মৃদুস্বরে "যাব" বলিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন নটবর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। গৃহস্থিত দেরাজের উপর একটী সুরা পূর্ণ বোতল ছিল, তাহা লইয়া বৈঠকখানায় গিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন, জীবনতারাকে কিছু বলিলেন না, কেননা নটবর নয়নতারাকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়া অবধি প্রায় জীবন-তারাকে ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া একাকী শয়ন করিতেন। তিনি প্রথম প্রথম জীবনতারাকে বলিয়া যাইতেন, এখন আর বলিতেন না।

ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নয়নতারা দিদিমণির সহিত আহারাদি শেষ করিয়া খোকাকে লইয়া আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া শয়ন করিল। জীবনতারা নয়নতারার সাজে স্বীয় কক্ষে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, নির্দ্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় গিয়া নটবর সমীপে উপস্থিত হইল।

তখন নটবর সুরাপানে উন্মত্ত, গৃহে উজ্জ্বলভাবে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল—জীবনতারা তাহা একটু কমাইয়া দিল। নটবর প্রতিক্ষণেই নয়নতারার অপেক্ষায় মদিরামুগ্ধ-নয়নে শয়ান ছিলেন, তিন রমণীর পদশব্দ শুনিয়া সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। গৃহের স্তিমিত প্রদীপ নিবিয়া গেল। সোৎসাহে নটবর কহিলেন, "নয়নতারা!—এসেছ? ভাল ভাল, আমি তোমার অপেক্ষায় এতক্ষণ নিদ্রা যাই নাই—তা এস—সরে এস. আজ আমি তোমার সঙ্গে এই নির্জ্জনে প্রাণের কথা বলি।" নয়নতারা ধীর পদবিক্ষেপে নটবরের পার্শ্বে গিয়া বসিল। নটবরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, তিনি কহিলেন, "নয়নতারা! আলো জ্বালো, আমি তোমার রূপে মজিয়াছি—একবার প্রাণভ'রে তোমায় দেখি।"

নয়নতারা ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "না, আলো জ্বাল্লে আমি থাক্‌ব না।" নটবর সুরাপানে উন্মত্তচিত্তে ও বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "তবে থাক্—তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও, আমি তাই ক'র্‌ব,—আমি তোমার সুখে সুখী।"

নয়নতারা কহিল, "একি তোমার সত্য কথা, না আমায় প্রলোভন দেখাচ্ছ ?"

নটবর। সত্যকথা নয়নতারা ! তুমি জাননা আমি তোমায় কত ভালবাসি, যদি দেখাবার হ'ত, তাহ'লে আমি হৃদয় খুলে দেখাতে পারতেম যে, তথায় তোমার মূর্ত্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

নয়ন। ভাল, তার প্রমাণ দিতে পার ?

নটবর। কেন পারব না, বল তুমি কি প্রমাণ চাও !

নয়নতারা কহিল, "তুমি দেখছি মদখেয়ে আত্মহারা হয়েছ, যে মদ্যপায়ী, তাহার কথা অবিশ্বাস্য, তুমি যদি আমায় ভালবাস, তা'হলে সেই ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই সুরাপান অভ্যাস একেবারে ত্যাগ কর দেখি।"

নটবর কহিলেন, "ভাল—স্বীকৃত হলেম, আর আমি সুরাপান করব না, এখন এস ! আমার হৃদয়ে এস !"

নয়নতারা কহিল, "আর এক কথা, তুমি দিদিমণির সর্ব্বস্ব, সে তোমায় ছাড়া জানে না, তুমি তাকে সর্ব্বসমক্ষে অগ্নি সাক্ষী ও বাপ-পিতামহের নামোচ্চারণ ক'রে সকল রকমে সুখী করবার ভার নিয়েছ, নিয়ে এখন তাকে একবার ভাবছ না, তুমি বিদ্বান, তোমায় আমি আর কি বলব ? তুমি যদি পবিত্র ধর্ম্মের নামে দিদিমণিকে বিবাহ ক'রে, তাকে ভু'লে অন্য নারীর রূপে মুগ্ধ হ'তে পার, তাহ'লে আমায় এই গোপনে গ্রহণ ক'রে কয়দিন সুখে রাখবে, তোমার চোখের নেশা কেটে গেলেই আমি যে পর, সেই পর থাকব, তুমি পুরুষ, সমাজে তোমার শত অপরাধ পরিত্যজ্য, দোষ ও লাঞ্ছনা হবে—অনাথা, অনাশ্রিতা নয়নতারার।"

নটবর নয়নতারার (?) মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ-ভাবে অবস্থিত থাকিবার পর কহিলেন, "নয়নতারা ! তুমি বুদ্ধিমতী, জেনো—আমি তোমারই থাকব।"

নয়নতারা কহিল, "একদিন তুমি দিদিমণিকেও এই রকম কথা বলেছিলে, এখন তাকে মনে নাই। আজ আবার আমায় বলছ, দু'দিন পরে আমাকেও ভুলে যাবে, পুরুষ প্রতারক—চঞ্চলমতি, কিন্তু নারী-হৃদয় সুদৃঢ়। ভ্রমর পাঁচ ফুলের মধুপানে আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু চাতকিনী একমাত্র বৃষ্টির জলপানেই সন্তুষ্ট।"

ইহা শুনিয়া নটবর একটু বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "নয়নতারা! চাতুরী ছাড়, আর তোমাব নিস্তার নাই, জান—তুমি এখন কি অবস্থায় পড়িয়াছ? এখন যদি আমি তোমার দিদিমণিকে ডাকি, তাহা হইলে কি হয় বল দেখি?"

নয়নতারা কহিল, "হবে আর কি? মহাজন যদি নিজের ধনাগারের চাবি সযত্নে নিজ সন্নিধানে রাখে, স্বেচ্ছায় অপরের হাতে তুলিয়া না দেয়, তাহা হইলে মহাজনের সম্পত্তি কোনও রূপেই নষ্ট হয় না, তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক লালসাপূর্ণ চিত্তে রত্নাদির প্রতি চাহিয়া থাকে, নিষ্ঠুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মহাজনের প্রাণনাশ না করিলে কোনরূপেই রত্নাগারের চাবি লইতে পারে না।"

"ভাল—আমি নিষ্ঠুর, দস্যু, তস্কর, যাহা বল তাই—আমি তোমার প্রাণ নাশ করিতে চাই না, আমায় তুমি হৃদয় দান করিয়া আমার প্রাণ-রক্ষা কর," এই বলিয়া নটবর নয়নতারার পদতলে পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া নয়নতারা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। নটবর তাহার করস্পর্শে আপ্যায়িত হইয়া তাহাকে হৃদয়াবেগে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "নয়নতারা, তবে তুমি আজ হ'তে আমার হৃদয়েশ্বরী, আর বৃথা লজ্জা কেন, প্রদীপ জ্বালিয়া এস আমরা ক্ষণকাল প্রেমালাপ করি, বল—তুমি আমার হ'বে।"

নয়নতারা (?) কহিল, "আমি তোমারই।"

নটবর। তবে প্রদীপ জ্বালি?

নয়ন। স্বচ্ছন্দে।

ইহা শুনিয়া নটবর সানন্দচিত্তে প্রদীপ জ্বালিয়া সহাস্যমুখে নয়নতারার সন্নিকটে আসিয়া তাহার মস্তকের আভরণ উন্মোচন করিলেন এবং কিয়ৎকাল অনাবৃত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "জীবনতারা! তুমি ?"

জীবনতারা কহিল, "হাঁ প্রভু আমি, তোমারই চরণাশ্রিতা, কেন, এখন কি আর মনে ধরিতেছে না ?"

নটবর লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করিয়া রহিলেন, জীবনতারার প্রতি আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না।

জীবনতারা তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিল, "নাথ! দাসী আমি তোমার, অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর, আর আজ আমি নয়নতারা সাজিয়া যদি তোমার প্রাণে কোন আঘাত দিয়া থাকি, সেজন্য কিছু অপরাধ লইও না—জেনো আমি তোমারই,—তুমিও আমার—অন্যের নও।"

নটবর জীবনতারার কথা শুনিয়া কহিলেন, "জীবনতারা! আমায় মার্জ্জনা কর, আমি মোহান্ধ-চিত্তে আজ যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা অতীব নিন্দনীয়। দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষুদ্র নর আমি, রিপুর দাস, তুমি আজ আমায় পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছ,—নচেৎ আমি আমার কৃতকর্ম্মের জন্য অহরহ অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতাম। স্ত্রী—স্বামীর সর্ব্বস্ব, তুমি যে আমার এই অধঃপতন দেখিয়া, আমার উপর বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমায় প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি; তোমার আদর্শ যেন বঙ্গের ঘরে ঘরে পরিগৃহীত হয়। নয়নতারার আর কোন চিন্তা নাই—তুমি যেমন তাহার ভগ্নী, আজ হ'তে তাহাকে আমি তেমনি আমার ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিব।"

জীবনতারা সহাস্যে কহিল, তাহ'লে আজ হ'তে সে তোমার

"দিদিমণি ?"

নটবর কহিলেন, "ভাল, আজ হ'তে সে আমার

"দিদিমণি !"

স্ত্রৈণের পরিণাম

(রূপক গল্প)

বসন্তকাল প্রাতঃসমীরণ, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তরস্থ পদ্মাকরে, অর্দ্ধবিকসিত শত পদ্মদলোপরে অলিকুলকে বিতারিত করিতেছে, অলিদল মধুলোভে মত্ত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিতেছে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তথায় বসিতেছে, তীরে নব পল্লবিত দুর্ব্বাদলকে কখনও বামে কখনও দক্ষিণে হেলাইয়া দিতেছে, আর সেই শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বিমুগ্ধা হইয়া একটী যুবতী কলসী-কক্ষে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, অন্যান্য গ্রাম্যবধুগণ সরোবরে অবতরণ পূর্ব্বক আপনাপন কলসী জল পূর্ণ করিয়া কেহবা শ্বশুর, কেহবা স্বামী, কেহবা ননদিনীর নিন্দা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, ক্রমে সকলেই চলিয়া গেল, যুবতী কলসী নামাইয়া উপবেশন করতঃ সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। পদ্মাকরের অপর পার্শ্ব হইতে কোন একটি যুবক,, যুবতীকে বহুক্ষণ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নিকটস্থ হইল। যুবতী অকস্মাৎ সেই যুবাকে দেখিতে পাইয়া লজ্জিত আননে কলসী জল পূর্ণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল, যুবক কোন কথা মুখনিঃসৃত না করিয়া তাহার পশ্চাদনুধাবন করিল ; এইরূপে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যুবতী একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিল। যুবকও তাহার অনুসরণ করিয়া প্রবেশোদ্যত হইলে দেখিতে পাইল যে, অট্টালিকার দক্ষিণদ্বারে খোদিত রহিয়াছে "স্ত্রৈণের পরিণাম," এবং বামদ্বারে একটী ছাগল বাঁধা, তাহার

শিরদেশে লিখিত যে, "যে কেহ এই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবেন তিনি এই ছাগলের মুখে তিন বার এবং বহির্গমন কালে পশ্চাতে তিনবার পদাঘাত করিয়া যাইবেন।"

যুবক বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহা বার বার পাঠ করিয়াও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যুবতীর প্রত্যাগমনাপেক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। সময় কাহারও বশীভূত নহে, দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, ক্রমে নৈরাশ্য-কাদম্বিনী, যুবকের প্রেম-আশা পরিপূর্ণ হৃদয়াকাশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থরে থরে আবৃত করিয়া ফেলিল; ঘোরান্ধকারাবৃত হৃদে এক একবার সৌদামিনী সদৃশ যুবতীর সেই কলসী কক্ষে দণ্ডায়মানাবস্থা উদয় হইতে লাগিল।

পাঠক! যুবকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় আপনাদিগের নানাপ্রকার সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু যুবতী অন্য কেহ নয়, যুবকের বিবাহিতা স্ত্রী, এই সুবৃহৎ অট্টালিকা একটী রাজবাটী, ইহাতে সে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি সন্তাপিত চিত্তে কোনও গতিতে দিনপাত করিত, ইহারা নিম্নশ্রেণীয় জাতি। কোনও একটী কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায় যুবক প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে বাটী হইতে দূরীভূত করিয়া বিদেশী হইয়াছিল, তখন তাহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর; এক্ষণে দুই বৎসর পরে স্বদেশে আসিয়া তাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, বিবাহিতা পত্নীর পূর্ণ যৌবনাবস্থার অপূর্ব্ব রমণ্য গুণে মুগ্ধ হইয়া যুবকের অতৃপ্ত লালসা উথলিয়া উঠিল। উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় পরস্পরেই পরস্পরকে চিনিতে পারিল, কিন্তু পূর্ব্ব বিবাদ স্মরণে কেহ অগ্রে সম্বোধন করিতে পারিল না, যুবতী লজ্জিতা হইয়া চলিয়া গেল, যুবক তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার মানসে সে আবার তথায় আসিলে তাহাকে বুঝাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু হায়!—তাহাকে আর আসিতে না দেখিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া হতাশ

অন্তরে সেই স্বর্ণ খোদিত অক্ষরগুলি পাঠ করিতে লাগিল—"স্ত্রৈণের পরিণাম"।

ইতিমধ্যে সকল ব্যক্তিই সেই বাটীতে প্রবেশ ও প্রত্যাগমনকালে ছাগলকে লিখিতরূপ পদাঘাত করিতেছিল, যুবক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গমনশীল ব্যক্তি মাত্রকেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কেহই তাহাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর যুবক ছাগলের মুখে পদাঘাত না করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলে সেই রাজবাটীর কোন একটি কর্ম্মচারী (যাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যে, যে কেহ ছাগলকে পদাঘাত না করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবে তাহাকে দূর করা) আসিয়া তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া ছাগলকে পদাঘাত পূর্ব্বক বাটীতে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। যুবক তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সে যুবতীর বিষয় আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল এবং তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য মিনতি করিল। কর্ম্মচারী যুবকের ঈদৃশ ঐকান্তিক অনুরাগ, কাতরতা ও স্ত্রীর প্রতি আসক্তি সন্দর্শনে কহিলেন, "যাহাতে তুমি তোমার স্ত্রীকে পুনঃপ্রাপ্ত হও, যাহাতে তোমাদিগের মনোমালিন্য বিদূরিত হয়, তাহার জন্য আমি সবিশেষ যত্ন করিব, কিন্তু সাবধান যেন স্ত্রৈণ হইয়া এই ছাগলের ন্যায় দুরবস্থাপন্ন হইও না।"

যুবক কহিল, "সে কিরূপ?"

কর্ম্মচারী কহিলেন, "কিছু বৎসর পূর্ব্বে ঐ অদূরস্থ কুটীরে এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন; তিনি অলৌকিক ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে মৃত জীবকে সজীবতা সম্পাদন করিয়া রাজার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি এই ভূস্বামীকে (আমাদিগের রাজাকে) বলিলেন যে, আমি যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃতজীবকে সজীব করিতে পারি, তাহা আপনাকে শিক্ষা দিয়া দেহ ত্যাগ করিব, আপনি

গভীরা রজনীকালে আমার সমীপে উপনীত হইবেন, আমি মন্ত্র দান করিব। রাজা স্বীকৃত হইয়া সানন্দচিত্তে এই বার্ত্তা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে কহিলেন। রাণী এই কথা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। রাজ পরামাণিক এই সকল কথা গুপ্তভাবে থাকিয়া শুনিতে পাওয়াতে, সেই রজনী কালে সেও অলক্ষিত ভাবে মহারাজার অনুসরণ করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী মহারাজাকে নিভৃতস্থানে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। সেই সুযোগে রাজপরামাণিক তাহা লিখিয়া লইল; এই প্রকারে উভয়ে মন্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। অনন্তর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর নরপতি আনন্দ উৎসব উপভোগাভিলাষে শীকারার্থ বহির্গমনের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় রাণী তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার বার বার অনুযোগে ও তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে রাণীকেও সঙ্গে লইলেন।

এই রাণীর স্বহস্তে পালিত একটি সারস ছিল, সুখে দুঃখে আহারে বিহারে যথায় যে ভাব থাকিতেন, তিনি তাহাকে সঙ্গে রাখিতেন; কিন্তু এই শীকারে যাইবার সময় তাহাকে বাটীতে রাখিয়া গেলেন। অতঃপর মহারাজ বহুদূর অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অরণ্যে উপনীত হইলেন।

প্রসাদনিবাসিনী অন্তঃপুরবিহারিণী রাজমহিষী অরণ্যের অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইলে সহসা সেই সারসকে মনে পড়িল। এবং তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য রাজাকে অনুনয় করিলেন, মহারাজ তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছেন ও এই অনুযোগে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; ইহাতে তিনি অভিমানবশে স্বকীয় গাত্রের অলঙ্কার রাশি উন্মোচন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহাতে অন্যান্য সহচরীগণ বুঝাইয়া বলিলেন যে,

রাজা অন্য এক দিবস সারসের সহিত এই অরণ্যে তোমায় লইয়া আসিবেন; রাণী কহিলেন—"না, তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি রাজার সহিত গিয়া সারসকে লইয়া আসি।" অতঃপর মহারাজ পত্নী প্রতি নিরতিশয় মমতা নিবন্ধনে তাঁহার সেই প্রার্থনা পূরনার্থ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! বাটী আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার প্রিয়তম সারস চিরতরে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রাণী শোকসন্তপ্তচিত্তে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য রাজাকে মিনতি করিতে লাগিলেন। মহারাজও স্ত্রী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মচারী প্রদত্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বকীয় জীবাত্মা সারসেতে উৎসাদিত করিয়া তাহাকে জীবিত করিলেন। এবং নিজ আত্মাকে পুনঃরায় স্বদেহে প্রবিষ্ট করিবার মন্ত্র বিস্মৃত হওয়ায় সেই দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত রহিল। রাজপরামাণিক সেই মন্ত্রপাঠ শুনিতে পাইয়া ত্বরায় সেইস্থানে আসিয়া এবং ব্রহ্মচারী প্রদত্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ আত্মা রাজদেহে প্রবেশ করাইয়া নিজ দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। রাজাত্মা সারস হইয়া প্রাণভয়ে উড়িয়া গেল, পরামাণিক রাজা হইয়া সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইল, আর স্বাভিলাষপূরণ-কারিণী সেই ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নী ভয়বিহ্বলা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন।

দীনহীন দুঃখ প্রপীড়িত পরামাণিক এইরূপে রাজাসন প্রাপ্ত হইলে শান্তিময় রাজভবন অশান্তি নিকেতন পরিপূর্ণ হইল। ভক্তিবৎসল প্রজাপুঞ্জ ও রাজকর্ম্মচারীগণ রাজার চরিত্র লইয়া নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিল। যে রাজা প্রজাবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থ অহর্নিশি চিন্তাগ্রস্ত থাকিতেন, যে রাজা স্বীয় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থ রাজকর্ম্মচারীগণের পরামর্শ গ্রহণেচ্ছুকচিত্তে সর্ব্বদা তাহাদিগের আগমন অপেক্ষা করিতেন, আজ সেই রাজ্য, সেই প্রজাপুঞ্জ, সেই রাজাসন, সেই কর্ম্মচারীগণ, সেই সব, কিন্তু হায়! তাহারা জানিত না, যে সেই রাজা স্ত্রৈণ বলিয়া পরিণামে

এক সারস হইয়াছে, আর সেই রাজদেহ-পিঞ্জরে অন্য একটি প্রাণ-বিহঙ্গম আশ্রয় লইয়া সমস্ত বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছে।

পরামাণিক রাজা হইয়াই আজ্ঞা প্রচার করিল, যে "যেখানে যত সারস দেখিতে পাইবে, অবিলম্বে তাহাদিগকে বধ করিয়া আমার নিকট লইয়া এস।" রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র শত শত ব্যক্তি তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য সারস বধার্থ বহির্গত হইল। বলা বাহুল্য দিন দিন রাশিকৃত সারস তাহার সমীপে প্রেরিত হইল,—অবশেষে আর সারস পাওয়া যায় না, রাজা (এখান হইতে আমরা পরামাণিককে রাজা নামে অভিহিত করিব) পুনঃরায় ঘোষণা করিলেন যে, "যে কেহ একটি সারস আনিয়া দেখাইতে পারিবে, তাহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।"

রাজা এপর্য্যন্ত ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীকে স্বীয় পত্নীরূপে পান নাই, কেবল তাঁহাকে পাইবার জন্য নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তাঁহার উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগও করেন নাই, কারণ রাণী বলিয়াছিলেন যে, তিন বৎসর পরে তিনি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে, কায়মনোচিত্তে ভর্ত্তারূপে গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে এই তিন বৎসর কাল তিনি ব্রত পরায়ণা অবস্থায় শুদ্ধাচরণে থাকিবেন। অনন্তর প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে পর, সেই রাজাত্মা বিশিষ্ট সারস দৈব যোগে এক কৃষকের জালে পতিত হইল, কৃষক তাহার প্রাণ বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ওহে ভাই! আমার প্রাণে মারিও না—তুমি আমায় রাজার কাছে লইয়া চল, সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।"

কৃষক কহিল, "তোমার এমন কি গুণ আছে যাহাতে সহস্র মুদ্রা মূল্য পাইবে।"

সারস কহিল, "যাহা পশু পক্ষীর অসাধ্য, আমি বুদ্ধিবলে তাহা অনায়াসে

সম্পাদিত করিতে পারি, তুমি পরীক্ষার্থ আমায় রাজার নিকটে লইয়া চল— আমায় দেখিবামাত্র তুমি সহস্র মুদ্রা পাইবে," কৃষক তাহার কথা শুনিয়া অবিলম্বে তাহাকে রাজ পরামাণিকের (উপস্থিত রাজার) নিকট লইয়া গেল।

রাজা স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে তৎপর হইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন, কৃষক প্রফুল্লচিত্তে সারসকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর নরপতি সারসকে বধোদ্যত হইলে সে তাঁহার পদতলে লুন্ঠিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! আমায় হত্যা করিবেন না, আমি আপনার কর্ম্মচারীর ন্যায় আপনার আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিব।"

ইহা শুনিয়া রাজা হাস্যবদনে কহিলেন, "রে সারস, তোর এমন কি ক্ষমতা আছে যে তুই আমার রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় আমার আজ্ঞা পালন করবি?"

সারস কহিল, "নরাধিপ, কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, যদ্যপি আমায় বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে কোন প্রকারে পরীক্ষা করিলে সবিশেষ অবগত হইবেন।"

রাজা ভাবিলেন,—রাণী তাঁহার স্বহস্তে পালিত সারসের নিরুদ্দেশ ও বধহেতু শোক প্রাপ্ত হইয়া বোধ হয় তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেছেন না, এক্ষণে এই সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ক্রীত সারসের অস্বাভাবিক গুণ শ্রবণে তিনি রাণীর চিত্তবিনোদন-মানসে তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাণীর সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—"সরলে, শোক তাপ পরিত্যাগ কর, আর কেন, আমার হৃদয়ে এস—তোমার অপূর্ব্ব রমণা-বহ্নি আমার আশা স্বজিত হৃদ-সিংহাসনকে দগ্ধ করিতেছে, আমি জীবিত থাকিয়া কুহকিনী আশার মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে কেবল নব নব লালসা আহুতি প্রদান করিতেছি—তুমি এই হৃদয়াসন শীতল কর—আমি শান্তি লাভ করি। তুমি কি হেতু দুঃখিত হইতেছ? অয়ি কল্যাণি!

একবার তোমার ঐ অপ্সরী বিনিন্দিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ আঁখি যুগল উন্মিলন করিয়া দেখ, তোমার কৃপাকণা প্রার্থী হইয়া তোমার সম্মুখে আসিয়াছি ; অয়ি সুহাসিনি ! একবার ঐ আনত আনন উত্তোলন করিয়া দেখ, তোমারই পরিতাপ মোচন মানসে আজ এই অদ্ভুত গুণশালী সারস তোমায় উপহার দিতে আসিয়াছি—তোমার স্বহস্তে পালিত সারস নিশ্চয়ই কালগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে—অতএব তাহার জন্য শোক করিও না,—রাজাত্মার জন্য শোক করিও না, কালের চিরন্তন প্রথা এক আসে আর যায়, যে গিয়াছে, তাহার স্মৃতি হৃদয় হইতে দূর করিয়া, প্রতি অস্থিতে অস্থিতে আমার মূর্ত্তি অঙ্কিত কর, তুমি আমি এক হইয়া এই অনিত্য জগতে কিছুদিন আনন্দ উপভোগ করি।”

শোকসন্তপ্তচিত্তে রাণী কহিলেন, “মহারাজ ! সত্যই এ জগৎ অনিত্য, পৃথিবীর প্রতি স্তরে স্তরে জলন্ত অক্ষরে অনিত্য প্রতিফলিত ; বসন্ত বায়ু সমাগমে জগৎ হাসাইয়া বৃক্ষ লতাদি নব নব পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া আবার নিরাভরন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, আশা এক আসে আর যায়, মনের চাঞ্চল্য মাত্র ; এই অনিত্য জগতে ক্ষণিক পার্থিব সুখানুভবে উন্মত্ত হইয়া আমার জীবনের একমাত্র অমূল্য ধন, আমার সর্ব্বস্বসার সতীত্ব রতন এই অনিত্য ভাবিয়াই আপনাকে অর্পণ করিতে পারি না, আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন, ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া সুখ-শান্তিলাভ করুন—আমায় ভুলিয়া যান।”

রাজা কহিলেন—“না সরলে ! না—ঐশ্বর্য্য চাই না—রাজ্য চাই না—আমি তোমায় চাই ;—তুমি আমার হইলে আমি চিরসুখী হইব।”

রাণী কহিলেন, “তবে অপেক্ষা করুন, আমার ব্রত উদ্‌যাপনের সময় আসিয়াছে, শীঘ্রই আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব।”

ইহা শুনিবামাত্র রাজা রাণীর সমীপে সারসকে রাখিয়া প্রফুল্লচিত্তে রাজসভায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজাত্মাবিশিষ্ট সারস স্বীয় প্রিয়তমা

পত্নীকে দেখিয়া অশ্রুধারা বিগলিত নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া রাণী সারসের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে বলিলেন, "আরে রে অবোধ জীব, তোর ন্যায় পরাধীন হইয়া আমিও অশ্রু-সম্বরণ করিয়াছি।"

সারস কহিল,—"রাণি! মহৎ ব্যক্তিদিগের উপদেশ অবহেলা করিয়া, আমি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া এ হেন অবস্থাপন্ন হইয়াছি,—ইহা যুক্তিসিদ্ধ—নারীগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, ন্যায্য সম্মানও দিবে, অলঙ্কারাদিও দিবে, কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে না। ভার্গব (শুক্রাচার্য্য) এই কথা বলিয়াছেন,—"পুরুষ যতক্ষণ গোপনে স্ত্রীগণের পরামর্শ না শুনে ততক্ষণ সে শ্রেষ্ঠ থাকে এবং ততক্ষণ সে গুরুজনে ভক্তিমান থাকে।" আমি এমনই হতভাগ্য যে পত্নী আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া শ্বাপদ শঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার মনস্তুষ্টি সাধনে দৃঢ়ব্রত পরায়ণ হইয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি।"

রাণী বিস্মিত, চকিত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "হে স্বামীন্, তুমি অভাগিনীর মন্ত্রণা শুনিয়াই এ হেন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ;—কিন্তু প্রভু! যদি অনাথ-নাথ, নিরুপায়ের উপায় শ্রীভগবানের করুণাগুণে আমাদিগের উভয়ে আবার সাক্ষাৎ ঘটিল, তবে এক্ষণে নিজের উদ্ধারের উপায় কর।"

সারস কহিল,—"প্রিয়ে! তোমার প্রতি পরামাণিকের ঐকান্তিক অনুরাগ ও আসক্তি দেখিতেছি, এবং তুমিও ব্রত পরায়ণাবস্থায় রহিয়াছ, আর যে স্ত্রীজিত, স্ত্রী-আজ্ঞার বশীভূত, তাহার দুর্দ্দশা সংঘটন হওয়া বিচিত্র নহে, পরামাণিক তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ, তোমার প্রেমে আসক্ত, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, অতএব তুমি তাহাকে বল, যে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে, তাহাতে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুবৃহৎ কাল ছাগলের আবশ্যক এবং তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করাইবার আজ্ঞা দিয়া তোমার নিকট লইয়া আসিতে বলিবে এবং ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ, বলিয়া পরামাণিকের প্রেমে

মুগ্ধা হইয়া তাহার প্রণয়ে তুমি পাগলিনী হইয়াছ এই প্রকার ভান করিয়া নিজ আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করাইবার মন্ত্র শিক্ষা করিবে।"

ইহা শুনিবামাত্র রাণী সানন্দচিত্তে কহিলেন, "স্বামিন্! যদি আমার বিন্দুমাত্র পতিভক্তি থাকে, যদি আমি কায়-মনঃ-প্রাণে সতী হই, তাহা হইলে অচিরাৎ স্বীয় পতি প্রাপ্ত হইব। আপনি অদ্য রজনী অপেক্ষা করুন, কল্য রাজাসন প্রাপ্ত হইবেন। ইহা বলিয়া তিনি রাজার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! কল্য আমার ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, আপনি একটি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ছাগল আনিতে আজ্ঞা করুন। রাজা—রাণীকে স্বীয় সম্মুখে সমাগতা দেখিয়া এবং এতদিনে তাঁহার প্রতি রাণীর আসক্তি জন্মিয়াছে দেখিয়া পুলকিতচিত্তে অনুচরবর্গকে রাণীর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর এক অনুচর একটি কৃষ্ণবর্ণ নিখুঁত ছাগল লইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল, রাজা তাহা লইয়া রাণীকে সমর্পণ করিলেন; পরদিবস প্রত্যুষে রাণী অনুচরবর্গকে ডাকিয়া কহিলেন —"তোমরা এই ছাগলকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আমার নিকট লইয়া এস, অনুচরবর্গ যথাজ্ঞা পালন করিল। অতঃপর রাণী গোপনে সারসের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সেই ছাগলকে হত্যা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! রক্ষা করুন, আমাদিগের সকল আশা ভরসা অতল জলে নিমজ্জিত হইল, যাহার জন্য আমি এতাবৎকাল আহার, নিদ্রা, সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া আসিতেছি, আজ নির্দ্দয় বিধি তাহার প্রতিকূল হইল।"

রাজা কহিলেন, "সুহাসিনি, চিন্তা করিও না—কি প্রকারে এই ছাগলের মৃত্যু হইল? যাহা হউক—আমি এখনই আর একটী ছাগল আনাইয়া দিতেছি—তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।"

রাণী কহিলেন—"না মহারাজ, আপনার মঙ্গলের জন্য আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া পূর্ব্ব শোক পাশরণের জন্য আমি মা সর্ব্বমঙ্গলার

নিকটে এই বলিদান দিতে ব্রত করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, এই ছাগলের মৃত্যু হওয়ায় আমাদিগের মহা অমঙ্গলের সূচনা হইল।”

রাজা কহিলেন—“তবে উপায় ? এক্ষণে কি করিতে হইবে বল।”

শোকসন্তপ্ত চিত্তে রাণী কহিলেন—“নরাধিপ, আপনি মন্ত্র প্রভাবে মৃত জীবকে সজীব করিতে পারেন, দাসী প্রতি যদ্যপি কিঞ্চিৎ করুণাকনা বিতরণ করিয়া এই ছাগলকে জীবিত করেন, ও তাহা সর্ব্বমঙ্গলার সমীপে যতক্ষণ না বলিদান দি, ততক্ষণ আপনার আত্মা ছাগলেতে উৎসাদন করেন, এবং কৃপা করিয়া নিজ আত্মা স্বদেহে প্রবেশ করিবার মন্ত্র অধিনীকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বমঙ্গলার অনুকম্পায় মর্ত্তে স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি করিব।”

রাজা কহিলেন, “সরলে! ইহার জন্যও চিন্তিতা হইও না—আমি রাজ্য চাহি না, ধন-মান চাহিনা, তোমায় চাই, তুমি আমার হইলে আমি অসাধ্য ও সাধন করিতে অপ্রস্তুত নহি”, এই বলিয়া রাণীর প্রার্থানুসারে কার্য্য করিলেন। রাজ দেহ আবার আত্মা শূন্য হইল ; রাণী সেই ছাগল সারসকে দেখাইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ সেই রাণী প্রদত্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ আত্মা নিজদেহে প্রবিষ্ট করাইল ; স্বাভাবিক মৃত্যুগ্রস্ত সারস মৃত ভাবেই পড়িয়া রহিল ; আর নারীরূপ-মোহে মুগ্ধ, নারীমন্ত্রে পরিচালিত হইয়া পরামাণিক অতুল ধনসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া এই ছাগলের অবস্থাপন্ন রহিয়াছে ; যথার্থ রাজা স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী ও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষী পরামাণিকের (এই ছাগলের) শিরদেশে এই প্রকার লিখিয়াছেন। যে ভৃত্য প্রভুর ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা না করিয়া প্রভুপদ প্রাপ্ত হইবার বাসনা করে সে এই প্রকার পদাঘাতেরই উপযুক্ত ; যে স্ত্রৈণ হয়, তাহার সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম, ঔদার্য্য, বল-বিক্রম, মাহাত্ম্য, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া এই পরামাণিকের ন্যায় পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম—তোমার পত্নীকে আনিয়া দিতেছি। কিন্তু সাবধান, স্ত্রৈ

হইবার পূর্ব্বে (আমাদিগের পাঠক মহাশয়গণও) একবার পরামাণিকের পরিণাম ভাবিও।" এই বলিয়া কর্ম্মচারী যুবককে সঙ্গে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করতঃ যুবতীর সহিত মিলন করিয়া দিলেন।

* * * *

যুবক যুবতী পুনর্ম্মিলিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।